স্মৃতি সত্তায় শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক ঃ শিক্ষাঙ্গনের যাত্রাপথ

পীযূষ বেরা

স্মৃতি কি আমারও আছে?
স্মৃতি কি গুছিয়ে রাখা আছে
বইয়ের তাকের মত* -

'স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল'। তবুও আমরা স্মৃতি-ক্যানভাসে এলোমেলো আঁচড় কেটে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করি। স্মৃতি-সমুদ্রে ডুব দিয়ে তুলে নিয়ে আসি কিছু নতুন চুনি-পান্না। সেই স্মৃতিতেই ডুব দিয়ে বুঝতে পারি, নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামটি শুধু কোনো একটা সাধারণ স্মৃতি নয়, একটি চুনি-পান্নাসহ 'সেন্টিমেন্ট'। ভালোবাসার বহুমুখী রূপের একটি ভাগ জমা হয়ে যায় এই নামটির খাতায়। সেই ভালোবাসার বহুরূপ যদি একত্রিত হয় তাহলে তার আস্বাদ্যমানতা বর্ধিত হয় বহুগুণ। একজন শিক্ষার্থীর স্মৃতিপটে যে ছবি ভেসে ওঠে তাতে দেখি - সেই সময়ে কাজ করা ছাত্রসুলভ সুতীব্র আবেগ, আর আজ সেই ছাত্রের সেই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকের চেয়ারে বসে যোগ হয়েছে নতুন দ্বিবিধ দায়িত্ববোধ - ছাত্রের সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, মহাবিদ্যালয়ের সম্পদ-সম্মান রক্ষা করা। কথা বলে কলম, আর কথা বলে পাঠ্যপুস্তকের কিছু আঁচড়। সেই কথা শোনার মতো মন প্রস্তুত করার দায়িত্ব কতটা কঠিন অথচ সুন্দর তা বোধ হয় দ্বৈত সত্তায় উন্নীত না হলে বোঝার সুযোগ থাকে না।

২০০৮। সদ্য স্নাতক উত্তীর্ণ হয়ে আকাঙ্ক্ষা জাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী করার। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়ার সুযোগ পেয়েও কোনো এক অমোঘ টানে পৌঁছে গিয়েছিলাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে সদ্য স্নাতকোত্তর পড়ানোর অধিকার পাওয়া বাংলা বিভাগে। আমরা ছিলাম এই কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম পড়ুয়া। শুরুটা সরল গদ্যের মতো ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ কি কলেজের শিক্ষকরা দিতে পারেন! পড়শির বাক্যবাণে কর্ণরন্ধ্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবার আগেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসকমণ্ডলী এবং বাংলা পরিবার কখন যে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে ফেলেছিল টের পাইনি। কবে যেন সেই পরিবারের নিকট আত্মার আত্মীয় হয়ে গিয়েছিলাম; সে দিনক্ষণ নির্ধারণ জ্যোতিষ চর্চাতেও ধরা যাবে না, তারজন্য নেই কোনো পঞ্জিকাও। বাংলা সাহিত্য-পরিবারের জ্ঞানী অভিভাবকদের নির্মোহ পাণ্ডিত্য আর অপার ভালোবাসা সদ্য স্নাতকের বন্ধু-বিচ্ছেদের যন্ত্রণাকে করেছিল অন্তর্হিত। পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষার পাশাপাশি নতুন কিছু করার ইচ্ছায় 'সিসৃক্ষা' (বিভাগীয় দেওয়াল পত্রিকা) তে আত্মপ্রকাশ বা 'হাতেখড়ি' (বিভাগীয় বার্ষিক পত্রিকা) নেবার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা অথবা

* শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

* স্মৃতি বড় উচ্ছৃঙ্খল, পূর্ণেন্দু পত্রী

স্বাধীনতা দিবসের দিনে (তখন হোস্টেল থেকে ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে নাটক করা হতো) মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে উপস্থাপিত নাটকের সংলাপ ভুলে গিয়েও সেখান থেকে নতুন শিক্ষা নেবার উদগ্র বাসনা চেপে বসেছিল সেদিন। খেলাধুলায় পারদর্শী নই, তাই বলে কি মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেব না, আছে তো যেমন খুশি সাজো। অধ্যক্ষের গাড়ি নিয়ে 'মোবাইল কানে নিয়ে পথচলার কুফল'-এ কী পরিণতি হতে পারে - তার অভিনয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে অধ্যক্ষের হাত থেকে পুরস্কার পাওয়ার দিনগুলি কেমন যেন আজ ঝাপসা হয়ে আসে। পাবজি আর মুখোশ খোলা-খেলার মাঝে তবে কি হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের শৈশবের দিনগুলি!

সৃজনশীলতা মানুষের একটি মৌলিক পরিচয় বহন করে। অনেকের ধারণা পাঠ্যপুস্তক নির্ভর পড়াশোনার বাইরে গিয়ে সৃজনশীলতার পাঠ নিলে অ্যাকাডেমিক নাম্বারে ঘাটতি হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের চৌহদ্দিতে যদি তার আনন্দঘন শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে তবে তা সংযুক্ত উন্নতমানের শিক্ষা লাভের স্থল হয়ে ওঠে। নেতাজী মহাবিদ্যালয় এবং বাংলা পরিবার সেই শিক্ষাই আগোগোড়া দিয়ে গেছে। শিক্ষার্থী হিসাবে সেইদিন তার লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হইনি। প্রাচীর টপকে কলেজ পালানোর পরিবর্তে প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার (তখন ছিল বয়েজ হোস্টেল, বর্তমানে এস. সি, এস. টি গার্লস হোস্টেল) থেকে কলেজে ঢোকা, আমতলার রক থেকে ক্যান্টিন, কখনো ক্লাসের ফাঁকে দ্বারকেশ্বরের পাড় অথবা ফাঁকা ক্লাসরুমে বন্ধুদের সাথে দেদার আড্ডা - কোথাও শিক্ষা লাভের অন্তরায় হয়ে পড়েনি সেদিন।

বহুদিন হলো আমিও হাঁটিনা এই পথ ধরে
সময় তো বয়ে গেছে নীরবে নদীর মতো ধীরে** -

কালের নিয়মে এসেছিল সেই শিক্ষাঙ্গনেই লব্ধ শিক্ষার প্রয়োগের পর্ব। 'কাব্যতীর্থ' নন্দলাল প্রামাণিক, 'একটি নক্ষত্র' অম্বুজ বসুর উত্তরাধিকারের যোগ্যতা প্রমাণের ঘরে ঠাঁই মেলে। যে শিক্ষা এতদিন বাংলা পরিবার থেকে পেয়ে এসেছি এবার পেয়েছি সেখানেই প্রয়োগের গুরুদায়িত্ব। ছাত্র হিসাবে যে ঘাটতি ছিল শিক্ষক হিসাবে বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে তা পুরণ করার মহাকর্তব্যবোধ আমাকে বেঁধে ফেলেছে দায়িত্ব-ডোরে। সেদিন যে যুবক ছিল ছাত্র, যার ছিল শুধু নেবার পালা, আজ তার শুধুই দেবার পালা। শুধুই ক্লাস নয়, তার বাইরেও যে শিক্ষা নেওয়া বা দেওয়া যায় তারই প্রচেষ্টা শুরু। ছাত্র হিসাবে যে ব্যারিকেড শিক্ষকের সাথে ছিল আজ তা অন্তর্হিত। শিক্ষকের প্রতি 'ভয় সুলভ শ্রদ্ধা' দূরে গিয়ে আজ এসেছে শুধুই 'শ্রদ্ধা'। ছাত্র-শিক্ষকের সূক্ষ্ম পর্দা সরে গিয়ে শিক্ষকের পাশে শিক্ষক হয়ে এসেছি আজ। শুধুমাত্র ক্লাসরুমে

** স্মৃতির আলাপনে, অপু সুলতান

পড়ালেই শিক্ষক হওয়া যায় না। চাই শিক্ষার্থীর সঙ্গে একাত্মবোধ। শিক্ষকতার প্রথমদিন থেকে যে শিক্ষকেরা 'ছাত্র-চরিত্র' নির্মাণ করেছিলেন তাঁদেরই সাহচর্য পেলাম 'শিক্ষক-চরিত্র' গঠনে। ছাত্রের গন্ধ 'গা' থেকে ধুয়ে মুছিয়ে শিক্ষক বানিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি এই কলেজের অন্যান্য বিভাগের আত্মজনসম অধ্যাপকগণ এবং অশিক্ষক বন্ধুরা। যাঁদের মধ্যে ছাত্রাবস্থায় পাওয়া স্বর্গীয় শৈলেনদা এবং স্বর্গীয় মহাদেবদা আজ আছেন না ফেরার নক্ষত্রের দেশে। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি নৈতিকতার শিক্ষা। তাই আজ তাঁদের 'অশিক্ষক' বলতে কোথাও বাধে।

ফেলে আসা কিছু স্মৃতি, কিছু প্রিয় মুখ
ভালোবাসার আবেশ জড়ানো চেনা সুখ।
কিছু কিছু সম্ভাবনা, আর কিছু কল্পনা
বিস্মৃতির অতলে হারানো কিছু প্রিয় ঠিকানা।***

জানি পাবোনা ঠিকানা। তাদের কাছে পাঠানো পত্র হয়তো ফিরে আসবে আমারই ফাঁকা চিঠি-বাক্সে। মহাবিদ্যালয়ের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিক্ষার সেই ক্ষুদ্র উপাদানগুলি আজ জীবনে চলার পথে পাথেয় স্বরূপ হয়ে গেছে। প্রায় অর্ধ দশক সময় অতিবাহিত হয়েছিল কলেজের অভ্যন্তরীণ পরিকাঠামো বুঝতে। তারই মাঝে কবে যে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের নৃত্য চপল ছন্দের তালে পা মিলিয়ে গা ভাসিয়েছি তা বোধহয় বোধাতীত। সাংস্কৃতিক পরিচালন সমিতির একজন সদস্য হয়ে সংস্কৃতিকে সঠিকভাবে উপস্থাপনা ও পরিচালনা করার মতো জায়গাটা মহাবিদ্যালয় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছিল যেদিন, সেদিন টের পেয়েছিলাম ধীরে ধীরে শিক্ষাঙ্গনের নাড়ির স্পন্দনের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছি। মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর নাড়ির স্পন্দন একতালে না চললে কোনো শিক্ষাঙ্গন সার্বিক উন্নতির শিখর স্পর্শ করতে পারে না। শিক্ষা, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক এক সুতোয় বাঁধা না পড়লে মূল্যবোধের বিনির্মাণ ঘটানো যায় না। শিক্ষাঙ্গন সেই মূল্যবোধ বিনির্মাণের কারখানা। আমরা তার কর্মী মাত্র। শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে সমাজকে করতে পারে আলোক উদ্ভাসিত। বর্তমান শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ, সৃজনশীল এবং নৈতিক শিক্ষা দিতে গিয়ে চোখ বন্ধ করে শিক্ষকের চেয়ার থেকে শিক্ষার্থীর বেঞ্চে মানস-পরিভ্রমণ করে তাদের নাড়ির স্পন্দন অনুভবের চেষ্টা করি; যাতে তারাও নিজেদের অপূর্ণ শিক্ষা এবং সৃজনশীলতা অকপটে প্রকাশ ঘটাতে পারে। বসন্তোৎসব থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বাইশে শ্রাবণ থেকে নজরুল দিবস বা শিক্ষক দিবসের মতো সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধানুষ্ঠান কোথাও যেন একাকার করে দিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ককে। মাঝে উপস্থিত হয়েছিল সেই

*** পুরনো দিনের কথা, অনির্বাণ মিত্র চৌধুরী

করোনা নামক অদৃশ্য দৈত্য। যার করাল গ্রাসে মানব জীবনের দুটি বছর বিলীন হয়ে গেছে। ছিনিয়ে নিয়ে গেছে জীবন-যৌবন। দিয়েও গেছে অনেক কিছু। গৃহবন্দিত্ব মাঝে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সেতু বন্ধনকে টিকিয়ে রাখা যখন একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন অন্তর্জালের মধ্য দিয়ে সেই দূরত্বকে নিকট করে সবকিছু স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা, সংগ্রাম করে টিকে থাকার ক্ষমতা, সহ্যশক্তি আমাদের বেঁচে থাকার নতুন উপাদানে পরিণত হয়েছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার মরিয়া প্রয়াসে হাত বাড়িয়েছিল তখন বিশেষভাবে শিক্ষার্থীরাই। তারা নতুন যৌবনের দূত হয়ে, স্পর্ধায় মাথা তুলে একের পর এক সাংস্কৃতিক মুহূর্ত উদ্‌যাপন করে গেছে অন্তর্জালের আশ্রয়ে। তার সাথে তারা নিতে শুরু করে পুঁথিগত শিক্ষাও। তাদের মধ্যেও তখন জেগেছিল দৈত্যের হাত থেকে মুক্ত করে সকলের সামনে নিজেকে উপস্থাপনের প্রবল তাড়না। শিক্ষাঙ্গনও হাত গুটিয়ে থাকেনি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিবিড় বন্ধনে কঠিন সময়কে সহজ করে নেবার পথ দেখিয়েছিল শিক্ষাঙ্গন। শিক্ষক হিসাবে সহনশীলতা, এগিয়ে যাবার প্রেরণা যে শুধু বাংলা পরিবার নয়, মহাবিদ্যালয়ের বৃহৎ পরিবার থেকে সঞ্জাত্যতাকে রোধ করবে কে! নেতাজী মহাবিদ্যালয় তাই শুধু শিক্ষার্থী তৈরি করে না, নির্মাণ না হয়ে আসা শিক্ষকেরও চরিত্র নির্মাণ করে। বর্তমান নিয়ে স্মৃতিচারণ হয় না। তাই বর্তমান চলুক বর্তমানের সাবালকত্ব নিয়ে। অঙ্কুরগুলো পরিণতি পাক মহীরূহে।

গানের তরী

অপর্ণা বিশ্বাস চট্টোপাধ্যায়

"বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুশি তারে দাও,
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।"

এ তরী সোনার তরী, এ তরী গানের তরী। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ। মহাবিদ্যালয়ের বৃহৎ সংসারের সর্বকনিষ্ঠ বিভাগ। ২০১৩ সালে এই তরুণীর যাত্রা শুরু। আজ মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছরের (১৯৪৮-২০২৩) দ্বারপ্রান্তে এসে পুষ্পে-পল্লবে শোভিত হয়ে অন্য সকল বিভাগের সঙ্গে এই বিভাগও পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের মান ও সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে।

২০১৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে সঙ্গীত বিভাগের প্রথম পঠন-পাঠন শুরু হয় ১৮ জন ছাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। কলেজের সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চে ক্লাস শুরু হয় অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে। তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহচর্যে শুরু হয় শিক্ষাদান পর্ব। কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ড. অসীম কুমার দে এবং পরিচালন সমিতির ঐকান্তিক অনুগ্রহে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় প্রশিক্ষণ সামগ্রীর বন্দোবস্ত হয়ে যায় খুব অল্পদিনের মধ্যে। নতুন একটি বিভাগ (সঙ্গীত বিভাগ) খুব অল্প সময়েই অন্য সকল বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠে। বিভাগীয় ছাত্রীদের সঙ্গেও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি তিনজন শিক্ষক-শিক্ষিকার। পঠন-পাঠন শুরুর এক মাসের মধ্যেই এগিয়ে এলো দুর্গোৎসব। সঙ্গীত বিভাগের ওই অল্প সংখ্যক ছাত্রীদের নিয়েই পরিকল্পনা করা হয় শারদ উৎসবের। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিরলস প্রচেষ্টায়, অধ্যক্ষ মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আরো অন্য বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্নেহে ও আনুকুল্যে পূজাবকাশের ঠিক পর্বে মঞ্চস্থ হল শারদোৎসব। সেই শুরুর বছর থেকে প্রতি বছর পূজাবকাশের ঠিক পূর্বেই আয়োজিত হয় শারদোৎসব। বৎসর এগিয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, উৎসবের জৌলুস বেড়েছে ক্রমে। অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। সকলের অংশগ্রহণ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শারদোৎসবকে অন্য মাত্রা দান করেছে। এই উৎসাহ এখন মহাবিদ্যালয়ের একটি বাৎসরিক

* শিক্ষিকা, সঙ্গীত বিভাগ

কর্মসূচীতে স্থান করে নিয়েছে।

"বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।"

শুধু কী পরিবেশনা, অনুষ্ঠান আর উৎসব! না, না পঠন-পাঠনও সমান তালে চলে বৈকি। সঙ্গীত, সে যে আমাদের বিষয়। আছে সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম ধরে নিয়মিত পাঠদান পর্ব। আছে পরীক্ষার প্রস্তুতি, আছে বর্ষে বর্ষে নতুন ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ। নতুন পড়া আর নতুন নতুন গান শেখা। এভাবেই কেটে যায় মাস, বছর। বছরের পর বছর বাড়তে থাকে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। বিভাগের ক্লাস বাড়ে। প্রয়োজন হয় নতুন শিক্ষকের। এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচজন। প্রেক্ষাগৃহের মঞ্চের যে ক্লাস তার দিন ফুরিয়ে আসে। নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা হয়। বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরাই বিভাগের সম্পদ। তারাই সৌন্দার্য্যায়ন ঘটাতে থাকে বিভাগের। বিভাগের শিক্ষাদান সামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তারাই কাঁধে তুলে নেয়। আজও সেই দায়িত্ব পুরাতনরা নতুনদের কাঁধে দিয়ে পঠন-পাঠন শেষে চলে যায়। এ এক বহমান ধারা -

শিক্ষাবর্ষ	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	শিক্ষাবর্ষ	ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা
২০১৩-১৪	১৮	২০১৮-১৯	৩১
২০১৪-১৫	২৫	২০১৯-২০	২৩
২০১৫-১৬	২২	২০২০-২১	৩০
২০১৬-১৭	৩০	২০২১-২২	২৫
২০১৭-১৮	৩৬	২০২২-২৩	২৩

২০১৬ সালে প্রথম একদল ছাত্র যোগ্যতার সাথে কলেজের পঠন-পাঠন সমাপ্ত করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য এগিয়ে যায়। ছাত্রীদের ফলাফল বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আত্মবিশ্বাসের ভিত মজবুত করে। এরপর প্রতিবছর অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ থেকে আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা"

দিনের একটা বৃহৎ সময় আমরা ব্যয় করি কর্মক্ষেত্রে। সেখানে নতুন বন্ধু হয়। শুরু হয় ভাব বিনিময়, কথার আদান প্রদান। শিক্ষা আরো পরিশীলিত হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আরেকটি জগৎ। প্রতিদিনের কুশল বিনিময়, বার্তালাপ দূরের অচেনা মানুষকে করে তোলে নিকট বন্ধু। পাঁচজন বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীর নিত্য সহাবস্থানে সঙ্গীত বিভাগে তৈরি হয় একটা ঘরোয়া পরিবেশ। গৃহ ছেড়ে কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেও খোলামেলা বাতাসের অভাব বোধ করেননি কেউই। ইতিমধ্যে ইন্দ্রানী ম্যাডাম পাড়ি জমালেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে। সঙ্গীত বিভাগ তাঁকে হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছিল। প্রার্থনা করেছিল তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। এ বিদায়ের মাঝে পূরবীর বিষাদ ছিল না। অর্ণববাবুও নতুন কলেজে চলে গেলেন। সে বিদায়ও বিষাদের ছিল না। দৈনন্দিন বিভাগের কাজের প্রয়োজনে যাওয়া-আসা, দূরভাষে নিয়মিত যোগাযোগ বিষাদের বাতাবরণ তৈরি করেনি কখনো। কিন্তু সময় কার জন্য কী নিয়ে অপেক্ষা করে আর বিধাতাই বা অলক্ষ্যে বসে কী বিধিলিপি লেখেন তার হদিশ আমরা পাই কোথায়? শারীরিক অসুস্থতাকে সঙ্গী করেও অসীম মনোবল নিয়ে সদাহাস্য মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের নিরন্তর উৎকর্ষ দান করে গেছেন অর্ণববাবু (অর্ণব চট্টোপাধ্যায়)। সকলের সাথে সদাহাস্যমুখে বার্তালাপ করা মানুষটি হঠাৎই চিরবিদায় নিলেন। কালচক্রের কাছে আমরা সকলেই নতজানু। ভগ্নহৃদয়ে অধ্যক্ষ মহাশয়ের কক্ষে বসে শিখেছিলাম - মেনে নিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। এগিয়ে যেতে হয়। নদীকে স্রোতহীন হলে তো চলে না। তাকে যে শৈবাল ঘিরে ধরে, তাই রাতের তারাকে দিনের আলোর গভীরে রেখে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হয়।

আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান নেতাজী মহাবিদ্যালয় আজ পঁচাত্তরের দ্বারপ্রান্তে। ব্যক্তিগতভাবে আমি দশটি বছর এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছি। এ আমার গর্বের পথচলা। এ আমার আনন্দের দিনাতিপাত। কত অভিজ্ঞতা, কত ঘটনাস্রোত কলমকে ঘিরে ধরছে আজ। হাসি-কান্নায় মোড়া কত স্মৃতি মনে ভিড় করে আসছে। সালটা ২০১৮। সঙ্গীত বিভাগের জন্য নতুন শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে। মনে মনে এমন সুখানুভূতি হচ্ছে যেন নিজের নতুন গৃহনির্মাণ হচ্ছে। সেই নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহের মধ্যে দিয়ে বিভাগকে সাজিয়ে তোলা হল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপস্থিতিতে সঙ্গীত বিভাগের জন্য নির্মিত অংশের দ্বারোদ্ঘাটন করা হল। সেদিনের উৎসাহ, আনন্দ, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝলমলে খুশিমাখা মুখগুলি সঙ্গীত বিভাগের স্মৃতির পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয় আরামবাগ সাবডিভিশন তথা হুগলী জেলা এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলাগুলিরও শিক্ষার মানোন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন আর্থসামাজিক স্তর থেকে উঠে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের আলোর দিশা দেখাতে সক্ষম আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়। আমাদের সঙ্গীত বিভাগেও দেখেছি সমাজের

বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের। দেখেছি মৃত মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্য পাদুকাহীন হয়ে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সঙ্গীত বিভাগে পড়তে আসা নন্দিতা দিগরকে। তার অসহায় পিতা জমিতে ধান কাটতে কাটতে মেয়ের সঙ্গে বিভাগে এসে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলে গেছেন - ''গোয়ালের গরুটা বিক্রি করে মেয়েকে তানপুরা কিনে দিয়েছি, মেয়েটাকে আমার দেখবেন ম্যাডাম''। আমি নীরবে কেঁদেছি। আজ আনন্দে বুক ভরে যায় যখন দেখি সেই মেয়ে স্বনির্ভর হয়ে অসহায় পিতার সহায় হয়েছে।

আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা এক একটি আলোকবর্তিকা। তারা শিক্ষার আলো বহন করে। সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা আলোকিত করে নিজ অঞ্চলকে। ভারতীয় সঙ্গীত, সংস্কৃতির প্রসার ঘটায় নিজ নিজ অঞ্চলে। এই বিষয়টি আমাকে গভীর আনন্দ দান করে। আমাদের সঙ্গীত বিভাগে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা শুরুর দিন থেকেই বেশি। বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ে পড়তে আসা রঙিন প্রজাপতির দল। তাদের হাসিমুখগুলো যদি সমাজ ব্যবস্থার চাপে দুর্যোগের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয় - তা কী কাম্য ? রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দের নারী স্বাধীনতার সংগ্রাম আজও প্রবাহমান। কত ঝলমলে মুখ, কত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ম্লান হয়ে গেছে - তাও দেখেছি। সম্ভাবনার মৃত্যু বারবার মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় কখনো সদর্থক ফল পেয়েছি, কখনো বা নিষ্ফল।

''কান্না হাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা
তারি মধ্যে চির জীবন বইব গানের ডালা''

ছাত্রজীবন যেমন মধুর স্মৃতি বহন করে, তেমনই ছাত্র-শিক্ষক মধুর সম্পর্কের স্মৃতি চির অমলিন। শ্রেণীকক্ষের বাইরেও শিক্ষামূলক ভ্রমণে, বিভাগীয় বনভোজনে বা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরে কোনো অনুষ্ঠান মঞ্চে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তথাকথিত সম্পর্কের বাইরে এসে অন্যরকম সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ফেলে আসা ছাত্রজীবনকে অনুভব করায়। কর্মজীবনের গায়ে লেপ্টে থাকা ছাত্রজীবনের মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে। ফেলে আসা স্মৃতির গা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলার সুযোগ আসে। প্রাপ্তির ঝুলি ভরে ওঠে ক্রমে ক্রমে।

আমরা সঙ্গীত বিভাগ ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দায়বদ্ধ। আমরা সাংস্কৃতিক কর্মী। সমাজের প্রতি আমরা দায়বদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশ। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অঙ্গনেও বিচিত্র সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছে। হুগলী জেলায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও পাশ্ববর্তী বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান প্রভৃতি জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ নিতে আসে সঙ্গীত বিভাগে। সঙ্গে করে তারা নিয়ে আসে নিজেদের আঞ্চলিক সংস্কৃতি। প্রথাগত পাঠ্যক্রমের বাইরেও চলে আঞ্চলিক গান, কবিতা, নাটকের চর্চা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভ্যন্তরীন বন্ধুত্বের মাধ্যমে চলে সংস্কৃতির আদান-প্রদান। বিভাগের করিডোর দিয়ে হেঁটে গেলে শোনা যায় বন্ধুদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় কথাবার্তা চলছে, গান হচ্ছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমিও বহুবিধ আঞ্চলিক সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ পেয়েছি সঙ্গীত বিভাগ থেকে।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই রয়েছে সাঁওতালী বিভাগ। আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে পাঠ নিতে আসে। সাঁওতালী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্গীত বিভাগে আসে গানের মহড়ায় বা নাচের মহড়ায়। তাদের আজন্ম লালিত সংস্কৃতি চর্চা বন্ধুত্বের পথ ধরে মিশে যায় অপরাপর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। তারাও বন্ধু হয়। বন্ধুর থেকে শিখে নেয় গান, কবিতা। ক্লাসের পঠন-পাঠন শেষে বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের কখনো গাইতে শুনি করমা পরবের গান, টুসুমণির গান, ভাদু লক্ষীর গান। এভাবেই গড়ে ওঠে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

"মেশে তেরো নদী সাত সাগরের জলে গঙ্গায় পদ্মায়"

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বিরাট ক্যাম্পাস, বিপুল বিল্ডিং সবই ইট, বালি, সিমেন্ট, চুন, কাঠ, ইস্পাত - এসব নিষ্প্রাণ বস্তু নির্মিত। তবু তাতে এত প্রাণশক্তির সঞ্চার হয় কীভাবে? ছাত্র-ছাত্রীদের কোলাহল, বহুবিধ মানুষের আনাগোনা, শ্রেণীকক্ষগুলিতে শিক্ষকদের পাঠদান, শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা, গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকদের যাওয়া আসা, কলেজ পরিচালনার জন্য সদাব্যস্ত দপ্তর, পঠন-পাঠনের মাঝে ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ক্যান্টিনে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া, একটু গল্প, হাসি - যেখানে এত প্রাণের সঞ্চার, সেখানে বুঝি ইট-বালির মতো নিষ্প্রাণ বস্তুতেও প্রাণ সঞ্চার হয়। ইতিহাস চির প্রবহমান। আজ যা ঘটমান, কাল তাই ইতিহাস। নেতাজী মহাবিদ্যালয় এক স্মৃতিময় অতীত, প্রাণময় বর্তমান এবং ঝলমলে ভবিষ্যৎ। মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ অতীতকে বুকে আঁকড়ে ঘটমান বর্তমানের সাথে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাবে। পুরাতন বিদায় নেবে, নতুন আসবে বাইতে গানের তরী।

খেলাধূলায় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ঃ সেকাল ও একাল

সঞ্জিৎ মণ্ডল

ছাত্রজীবন শুধুমাত্র পড়াশোনার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা পায় না। পূর্ণতা পায় খেলাধূলা, শরীরচর্চা সহযোগে সুস্বাস্থ্য অর্জনের মধ্যে দিয়ে। পড়াশোনা যেমন আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় ঠিক তেমনি খেলাধূলা আমাদের দৈহিক ও মননেরও বিকাশ ঘটায়। রোগজীর্ণ কিংবা অপুষ্ট শরীর মানুষের কোনো কাজের সহায়ক নয়। মানসিক সুস্থতা এবং সজীব দেহ গঠনের জন্য প্রয়োজন খেলাধূলার। খেলাধূলার দ্বারা আমাদের দেহের ক্লান্তি যেমন দূর হয়, তেমনি মনের প্রশান্তিও ঘটে; এক নির্মল আনন্দের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দৈনন্দিন কাজে নিত্যনতুন উৎসাহও পাওয়া যায়। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যুব অবস্থায় কলকাতার টাউন ক্লাবে ফুটবল খেলতেন। এই খেলার মধ্যে দিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানসিক সংযমকে। পরিশ্রম করার ক্ষমতা, শৃঙ্খলা বোধ ইত্যাদির উদ্ভাবন খেলাধূলার মধ্যে দিয়েই পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ তাই দেশের যুবসমাজের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন - 'গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে'। একজন শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে যদি তার স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গি না করে তাহলে ধরে নেওয়া হয় সে শিশু মৃত। কিন্তু যদি বিপরীত বিষয় হয়? যে শিশু মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই সারা দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গের সংকোচন প্রসারণ ঘটায়, হাত-পা ছোড়ে এবং কান্নাকাটি করে তখন মা তার সমস্ত প্রসব যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে মেতে ওঠেন। অর্থাৎ বোঝা যায় শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই তার শরীরের অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের সংকোচন-প্রসারণের সাথে সাথেই তার দৈনন্দিন খেলাধূলার জীবনযাত্রা শুরু করে দেয়, তখন থেকেই তার ফিজিক্যাল এ্যাক্টিভিটি আরম্ভ হয়।

প্রাচীন সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে বড় বড় গাছের ডাল এবং পাথর ভেঙে বিভিন্ন অস্ত্র বানিয়ে পশু শিকার করতো এবং গুহায় বসবাস করতো। পরবর্তীকালে রামায়ণ-মহাভারতের যুগে গুরুগৃহে শিক্ষার সাথে সাথে শরীর চর্চারও পরিচয় মেলে। প্রাচ্যের পাশাপাশি আমরা যদি পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো, প্রাচীন গ্রিসে একসময় বড় বড় দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, গণিতজ্ঞ, সঙ্গীতজ্ঞরাও জিমনাস্টিক, অসি চালনা, রথ দৌড়, বর্শা নিক্ষেপ প্রভৃতি খেলায় অংশগ্রহণ করে জীবনের মূল স্রোতকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আমরা আধুনিক অলিম্পিকে প্রবেশ করি। সেখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অর্থাৎ খেলাধূলার সঙ্গে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে যুক্ত করে খেলাধূলাকে অত্যধিক আকর্ষণীয় ও প্রফেশনাল

* বিভাগীয় প্রধান, শারীরশিক্ষা বিভাগ

করে তোলা হয়েছে। কলেজ জীবনে ছাত্র-ছাত্রীরা একাডেমিক শিক্ষা নেবার সাথে সাথে শারীরশিক্ষা চর্চার মধ্যে দিয়ে নিজেদের সামাজিক সম্মান এবং অর্থকরী দিকেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। একটি প্রবচনে আছে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তার কথা - 'সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস'। আর সেই সুস্থ-সবলতার একমাত্র উৎস হলো খেলাধূলা।

খেলাধূলার উন্নতিকল্পে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে পড়াশোনার পাশাপশি ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে খেলাধূলার মাধ্যমে নিজেদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে, তারজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শারীরশিক্ষা নামক একটি বিষয়কে মূল শিক্ষার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার মাধ্যমে সমাজে আদর্শ মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শারীরশিক্ষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ১৯৯৭ সাল থেকে শারীরশিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে শারীরচর্চার শিক্ষা দিয়ে আসছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীনতার পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ১ লা আগষ্ট মাননীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় ও তাঁর অনুগামীরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রথমদিকে টিনের চাল ও ইটের দেওয়াল ছিল শিক্ষাদানের মূল আবাসস্থল। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান মহাবিদ্যালয় যে সুবিশাল বিস্তৃতি পেয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ যে কোনো শিক্ষাঙ্গনের সমতুল্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে-র সুশাসনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা নির্ভয়ে কলেজ হোস্টেলে থেকে উন্নত মানের একাডেমিক শিক্ষা নেবার পাশাপাশি শারীরচর্চার মধ্যে দিয়ে নিজেদের উন্নতির পরিচয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছে।

ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি নিশ্চিন্তে খেলাধূলা করতে পারে তারজন্য কলেজে সুবিশাল খেলার মাঠ উন্নত শারীরচর্চা করানোর পরিচয় বহন করে। উন্মুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ক্রীড়াঙ্গন কলেজটির একটি মৌলিক পরিচয়কে সামনে আনে। ছোট ছোট গাছ দিয়ে ঘেরা প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃত স্পোর্টস এরিনা কলেজটির মোট সম্পত্তির প্রায় অর্ধেক অংশ। অর্থাৎ কলেজটি খেলাধূলা তথা শরীর চর্চাকে কতটা বিশেষভাবে প্রাধান্য দেয় তারই সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। কলেজের অধ্যাপক থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিদিনের রুটিন মাফিক খেলাধূলার অভ্যাস চালিয়ে যায়। শুধুমাত্র এই মাঠ শারীরশিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী বা অধ্যাপকেরাই ব্যবহার করেন তা কিন্তু নয়, অন্যান্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণও এই খেলার মাঠে শরীরচর্চা করতে আসেন। শিক্ষাঙ্গনের পড়াশোনার বাইরে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা বিকালে নিজেদের মতো করে খেলাধূলায় মেতে থাকে। কলেজে এন. সি. সি-র অধীনে বিভিন্ন ড্রিল, ম্যাচিং, প্যারেড চর্চা হয়ে থাকে। এন. সি. সি-র অধীনে ১৫ই আগষ্ট, ২৬শে জানুয়ারী, কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস ইত্যাদি বিভিন্ন

অনুষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে পালন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি এন. এস. এস-এর টিমগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বার্তা নিয়ে কার্যকলাপ চালিয়ে যায় সারা বছর ধরে। এ সমস্ত কিছুই শরীরে কসরত এবং শরীরচর্চার মধ্যে দিয়েই করা সম্ভব, যা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগ সফলতার সাথেই পরিচালনা করে থাকে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার মূল্যায়ক হিসাবে প্রত্যেক বছর বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সংখ্যাই বলে দেয় শারীরশিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবাসার কথা। সর্বাধিক প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণের মাত্রা, প্রতিযোগিতার বিষয়, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতি, অতিথি অভ্যর্থনা কোনো অংশেই বিশ্ব অলিম্পিকের থেকে কম নয়। নেতাজী মহাবিদ্যালয় পালিত অন্যান্য প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হিসাবে ধরা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য মাত্রার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি উপস্থিত থাকেন কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ, বিভিন্ন বিশিষ্ট অতিথিবর্গ, এস.ডি.ও., বি.ডি.ও. এবং প্রাক্তন কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা। শারীরশিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় খেলার মাঠ তখন হয়ে ওঠে বিশ্ব আনন্দ-যজ্ঞের পাঠশালা।

খেলাধুলাকে আরও আকর্ষণীয় করতে উন্মুক্ত ক্রীড়াঙ্গনের পাশাপাশি অত্যাধুনিক মানের মাল্টিপারপাস জিমনাসিয়াম গৃহের নির্মাণ কলেজের মুকুটে নতুন পালক সংযোজন করেছে। যদিও মাল্টিপারপাস জিমনাসিয়ামটি মূল ক্যাম্পাস থেকে দূরে অবস্থিত, তবুও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার আকর্ষণ কোনো অংশে কম নয়। এখানে ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমান প্রজন্মকে অত্যাধুনিক মানের গড়ে তোলার জন্য স্মার্ট ক্লাসরুম। এনাটমি, ফিজিওলজি, বায়োমেকানিক্স, সাইকোলজি ওরিয়েন্টেড ল্যাব। এছাড়াও ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ওয়েট ট্রেনিং রুম, ড্রেস চেঞ্জিং রুম, স্পোর্টর্স স্টোর রুম নির্মিত হয়েছে। ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্ট, ভলিবল কোর্ট, টেবিল টেনিস কোর্ট কলেজের মাল্টিপারপাস ফিজিক্যাল এ্যাক্টিভিটিগুলিকে সক্রিয় ও সতেজ রেখে চলেছে।

পুঁথিগত বিদ্যা, শারীরশিক্ষা বিদ্যার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকর্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাবলিক রিলেশনে জোর দেওয়া হয়। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে জিমনাসিয়ামের দ্বার খুলে দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী গরীব মানুষদের আশ্রয়স্থল হিসাবে। ছাত্র-ছাত্রীরা তখন স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসে। ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সেবার্থে।

শরীরচর্চা মানে শুধু ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল বা টেনিস খেলা নয়, তার সাথে সাথে জড়িয়ে রয়েছে যোগাসনও। যেখানে মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজনও যোগা অভ্যাস করে নীরোগ শরীরে সুস্থ জীবন যাপন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। এককথায় বর্তমানে শরীরচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

আজ কলেজের যে উন্নতি, বিশেষভাবে শারীরশিক্ষা বিভাগের প্রযত্নে পড়াশোনা যে স্থানে পৌঁছেছে তা হঠাৎ করে হয়নি। এর পিছনে বহু মানুষের বহুদিনের প্রচেষ্টা মিশে আছে। বর্তমান অধ্যক্ষের পাশাপাশি প্রাক্তন এবং বর্তমান বিভিন্ন অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, স্থানীয় কিছু চিন্তাশীল মানুষের সমন্বয়ে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শারীরচর্চা বিভাগ আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা লগ্নে মহাবিদ্যালয় খেলাধূলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও ১৯৪৯ সালে ফুটবল এবং ভলিবল খেলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগস্ট নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ টাউন ক্লাবের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয়, সেই খেলায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় ১-২ গোলে বিজিত হয় এবং সেই খেলা দেখতে অতিথি হিসাবে মাঠে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। এটাই ছিল কলেজের প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের মধ্যে ম্যাচ ড্র হলে পরবর্তীকালে আরও দুটি ম্যাচ হয়, কিন্তু সে ম্যাচগুলিও ড্র অবস্থায় শেষ হয়। উক্ত ম্যাচে দর্শক আসনে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক গুণী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৪৯ সালের ৯ জানুয়ারি আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় বনাম আরামবাগ টাউন ক্লাবের মধ্যে একটি ভলিবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়ছিল। এই প্রতিযোগিতায় কলেজ বিজয়ী হয়। এইভাবেই প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলার মানকে বাড়িয়ে চলেছে নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় শারীরশিক্ষা বিভাগকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় জোয়ার আসে ২০০৯ সাল থেকে। বর্তমানে শুধুমাত্র ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট খেলা নয়, পাশাপাশি চলতে থাকে অ্যাথলেটিক্স, হ্যাণ্ডবল, কবাডি, খো-খো, ব্যাডমিন্টন, তীরন্দাজি, জ্যাভেলিন থ্রো, যোগাসন প্রভৃতি, যেগুলিতে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরষ্কৃত হয়ে কলেজের মানকে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রায় প্রত্যেক বছরই প্রথম সারিতে উঠে আসে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়াও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হ্যাণ্ডবল প্রতিযোগিতায় বিগত বছরগুলিতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপঙ্কর রুইদাস, ঝুমা মণ্ডলরা। ২০২২ আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় বাংলা বিভাগের ছাত্র সূর্য মুখার্জী চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস্ হয়ে কলেজের মান বর্ধিত করেছে। উক্ত বছরই মেয়েদের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলেজ থেকে ঝুমা রায়, বিউটি টুডু, খুশি মালিক সহ অন্যান্য ছাত্রীরা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে বহিঃরাজ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। খো-খো খেলাতেও

ছাত্ররা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে বহিঃরাজ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। এছাড়াও সরকার পরিচালিত ইন্টার কলেজ স্টেট স্পোর্টস এণ্ড গেমস্ চ্যাম্পিয়নশিপেও আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য চোখে পড়ার মতো।

ছাত্রজীবনে খেলাধূলার গুরুত্ব আজ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন। সেইজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রমে শারীরশিক্ষা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কারণ খেলাধূলা মানুষকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে, জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে এবং ছাত্র জীবনের সুঅভ্যাস গঠন করতে শেখায়। খেলাধূলার সাথে জড়িত একজন ছাত্র বা ছাত্রী তাই শুধু কলেজের সম্পদ নয়, রাজ্যের ও দেশের সম্পদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। একটি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র হিসাবে একজন খেলোয়াড়ই যথেষ্ট হয়ে ওঠে। যে কারণে বিশ্বব্যাপী খেলাধূলার ব্যাপক প্রচলন বর্তমানে চোখে পড়ার মতো। ব্যক্তির সার্বিক বিকাশে এবং আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার পাশাপাশি তাই খেলাধূলার ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তারই অংশীদার হিসাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শারীরশিক্ষা বিভাগ অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ আমার চার বছরের অভিজ্ঞতা

জাহাঙ্গীর কবীর মণ্ডল

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বয়স আজ পঁচাত্তর বছর। বয়সের দিক থেকে বেশ প্রবীণ। আজ শুধু এই রাজ্য নয়, ভারতবর্ষ, এমনকি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রতিষ্ঠান একটি পরিচিত নাম। প্রতিষ্ঠানটির তুলনায় বয়সে আমি কিন্তু একেবারেই নবীন। এই কলেজে আমি যোগদান করেছি মাত্র চারবছর আগে। প্রসঙ্গত বলি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সানতালি বিভাগে পড়ার সময়, এমনকি তার আগে থেকেই বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে এই মহাবিদ্যালয়ের যথেষ্ট সুনাম ও সৌরভ আমার কর্ণগোচর হয়েছিল। তখন থেকেই এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করার সুপ্ত বাসনা আমার মনের মধ্যে জাগরুক ছিল। এটি বাস্তব রূপ পায় NET ও SET-এ উত্তীর্ণ হয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে Recomendation Letter (সুপারিশ পত্র) এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সম্পাদক তথা অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে-র কাছ থেকে নিয়োগপত্র পাবার পর। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আরামবাগ শহরের অদূরে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমতীরে কালিপুর গ্রামে ১৯৪৮ সালের ১ আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামক মাতৃমন্দিরে যোগদান করি। তারিখটা ছিল ১৯ জুলাই, ২০১৯। উল্লেখ্য, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমার নৈতিক কর্তব্য ও সেবামূলক আদর্শকে সামনে রেখে ঐদিন থেকেই পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করেদিলাম।

এখন প্রাসঙ্গিক কিছু কথা বলে নিই, যেগুলির সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার যোগ নিবিড়। যোগদানের দিন প্রথমেই অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং যোগদানের কাজ সম্পন্ন হল। যোগদান করতে গিয়ে কলেজে যা দেখলাম, আমার কল্পনার সঙ্গে তার দুস্তর ফারাক। আমার কল্পনার চেয়েও তা অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি সাজানো-গোছানো। আরামবাগ শহরে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সুন্দরভাবে সুসজ্জিত বিশালাকার কলেজটি দণ্ডায়মান। আমি এতটা ভাবতেও পারিনি। গেটে ঢোকার পর একদিকে সুন্দর খেলার মাঠ আর একদিকে ফুলের বাগান, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। চারিদিকে যে সমস্ত কলেজ দেখেছি আর তার সঙ্গে এই পবিত্রভূমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অনেকটা পার্থক্য চোখে পড়ল।

প্রথমদিন অনেকের কাছ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা, রাস্তায় যেতে যেতে অন্যান্য স্যারদের সঙ্গে দেখা, আলাপচারিতা, অধ্যক্ষ মহাশয়ের উদারতা, মাধুর্যতা, তাঁর আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা, সন্তানস্নেহে তথা সহকর্মী স্নেহে দেখা -কোনোদিন অভাব বুঝতে পারিনি। কলেজে আরও অন্যান্য স্যার ও ম্যাডামদের ব্যবহার

* অধ্যাপক, সানতালি বিভাগ

আমাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রথম যোগদানের দিন তীর্থঙ্কর স্যার, বাসুদেব স্যার - এনাদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় আমাকে অনেকটা আপন করে নিয়েছিল। বড়বাবু শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ কুণ্ডু, রসায়ন বিভাগের অমিত স্যার - আমার যোগদানের কাজটি সঠিকভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যা দেখে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। তাছাড়া সামিম স্যার, সৌমেন স্যার, রহিম স্যার যে কোনো ভাবে, যে কোনো মুহূর্তে, যে কোনো কাজে সাহস এবং সাহায্যের আশ্বাস দিলেন। আমি রীতিমতো হতবাক হলাম। সর্বোপরি প্রত্যেক স্যার-ম্যাডামদের ব্যবহার ছবির মতো মনে হয়েছিল। প্রথমদিনই মনে হয়েছিল অনেকদিনের পরিচিত মানুষজন, যাঁদের সঙ্গে আমার যেন একটা দীর্ঘযোগসূত্র ছিল। তাঁদের শুভেচ্ছা, স্নেহ, ভালবাসা কখনো ভোলার নয়, আজীবন মনে রাখার মতো।

এখানে এসে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম যেটা আমাকে এই কলেজ সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এই কলেজে এসে দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো আলাদা আলাদা বিভাগ, আলাদা আলাদা অফিস। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয় নাকি কলেজে যোগদান করলাম! বন্ধু এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল পেলাম।

সানতালি বিভাগে যোগদানের পর প্রথম যখন বিভাগে গেলাম বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটা সানতালি বিভাগ। কয়েকটা বিভাগে যাওয়ার পর নাম না দেখে বুঝতে পেরেছিলাম এগুলো কোন্ কোন্ বিভাগ। বিষয় অনুযায়ী বিভাগগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো। নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে প্রথম দিনই ভালোবেসে ফেলেছিলাম। এতো ভালো কলেজে যোগদানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেজন্য খুব গর্ববোধ করছিলাম। আমার বিভাগে প্রথম থেকেই বিভাগের অন্যান্য স্যারদের সহযোগিতা আমাকে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে দেয়নি। আমার বিভাগে দূর-দুরান্ত থেকে এতো ছাত্র-ছাত্রী দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো। আমি প্রথম ক্লাসে গেছি সেমিস্টার-১-এর। আমি বোর্ড ওয়ার্ক করছিলাম, কয়েকটি ইংরাজি শব্দ এবং সেটা আমি ইংরাজি script-এ লিখলাম। একজন ছাত্র হঠাৎ উঠে বলল, স্যার আপনি অলচিকিতে লিখুন। আমি সঙ্গে সঙ্গে অলচিকিতে ইংরাজি নামগুলো লিখে দিলাম। কিছুদিন পর ওই ছাত্রটি দেখছি বাংলা script-এ পরীক্ষা দিচ্ছিল, আবার অলচিকি script দেখে পড়তেও পারছিল না। আমি রীতিমতো অবাক হয়েছিলাম। ছাত্রটিকে আমি এহেন আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোনো উত্তর না দিয়ে বলেছিল, 'স্যার আমার ভুল হয়েছে'। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য, সহযোগিতা, ভালোবাসা আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিল। আমার বিভাগের উন্নতির জন্য অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতা ভোলার নয়। তাছাড়া এই কলেজে আর একটা বিষয় প্রথমদিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, যেটা অন্য কলেজে নেই বললেই চলে। সেটা

হলো, একটা বিভাগের সঙ্গে আর একটা বিভাগের আত্মিক সম্পর্ক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেটা না বললেই নয়, পঠন-পাঠন পদ্ধতি। সবরকমভাবে সাহায্য সহযোগিতা ছাত্র-ছাত্রীরা পায় এবং তারা খুব সহজেই নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।

কলেজের ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিয়েছি। সেগুলিতেও আমি মুখরিত হয়েছি। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাণচঞ্চল বক্তব্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ সংস্কৃতি প্রদর্শনী, তাদের দক্ষতা দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ না দিতে পারা আমার কাছে বড়ো ঘাটতি, অপূরণীয় ক্ষতি বলে মনে হয়। প্রথমদিন থেকেই যে কোনো অনুষ্ঠান আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করতো। সবচেয়ে বেশি মন কেড়েছিল শিক্ষক দিবসের আগে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুতি। প্রত্যেক বিভাগে গিয়ে স্যার-ম্যাডামদের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ভাবে হাতে তৈরি রং-বেরঙের নিমন্ত্রণ পত্র দেখে আমি অবাক হয়েছিলাম। তাদের ভাবনাচিন্তা, সৃজনশীলতা সত্যিই প্রশংসনীয়। তাছাড়া শিক্ষক দিবসের দিন বিভিন্ন বিভাগের এতো সুন্দর পারফরমেন্স দেখে একটা কথা মনে হয়েছিল, এইভাবেও সবকিছু করা যায়।

আমরা হঠাৎ একবিংশ শতকের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলাম। শেষ করলাম মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কোভিড ভাইরাসকে। সদ্য যোগদানের কয়েক মাস পরেই শুরু হল বিচ্ছেদ, ছাত্র-ছাত্রী এবং সহকর্মীদের সঙ্গে। দীর্ঘ দু'বছর এক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করলাম। আমার প্রিয় কর্মস্থলের মানুষদের না দেখে সত্যিই কঠিন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছি। প্রিয়জনদের এতো ভালোবাসা না থাকলে মনে হয় এতটা কষ্ট পেতাম না। সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পর যেদিন কলেজে এলাম মনে হলো আরো একবার নতুন করে কলেজে যোগদান করলাম।

সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের একটা অংশ হিসাবে থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত ও ধন্য মনে করছি। ভবিষ্যতে এরকম আরো পারফরমেন্স দেখবো আশাকরি। কালের নিয়মে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। একদিন হয়তো আমিও থাকব না বা যাঁরা আমার সঙ্গে আছেন তাঁরাও হয়তো একদিন থাকবেন না। আমার স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন বিদায় দিতে হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে যে স্মৃতি, তাদের যে ভালোবাসা, সেই ভালোবাসাগুলি অমলিন, অক্ষয় হয়ে স্মৃতিতে থেকে যাবে। এই স্মৃতি ভোলার নয়। এই পবিত্র ভূমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হোক। আমার তরফ থেকে যেটুকু প্রচেষ্টা তা সর্বদা, সর্বক্ষণ থাকবে। ভবিষ্যতে এই কলেজ উত্তরোত্তর উন্নতি করবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান

শঙ্কর কুমার মুখার্জী

একদিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং অপরদিকে শ্রদ্ধেয় ও প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার উদ্যোগ। একদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান - স্বাধীন ভারতবর্ষ - সার্বভৌম সরকার প্রতিষ্ঠা - অপরদিকে স্বাধীন ভারতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সম্প্রসারণ। অনুকূল পরিস্থিতির সুবাদে ১৯৪৮ সালের ১লা আগস্ট কালিপুরে 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' নামাঙ্কিত বটবৃক্ষের চারা রোপণ।

তৎকালীন সময়ে কালিপুর ও আরামবাগের কতিপয় শিক্ষানুরাগী সহৃদয় পরিবারের নিঃস্বার্থ অবদানে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হতে দেখা যায়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় ও তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতিবিদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়। বৃক্ষটির মূল কাণ্ড হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিষ্ঠান গঠন করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় ভূমি। আজ যদি স্থানীয় পরিবারগণ যথা - আঢ্য, বল্লভ, কুণ্ডু ও নন্দীরা ভূমিদান না করতেন তাহলে হয়তো কোনোদিনই প্রতিষ্ঠানটি এই এলাকায় গঠন করা সম্ভব হত না। সেজন্য স্থানীয় পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হয়। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্থিক সাহায্য, স্থানীয় কৃষকগণের মাঠের ফসল বিক্রি করে অর্থদান ও কায়িক শ্রমদান প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি সুদৃঢ় করতে লাগলো। একেবারে গোড়ায় আঢ্য পরিবারের গৃহতে ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে কতিপয় ছাত্রদের পঠন-পাঠন শুরু হয়। পরে ১৯৫১ সালে বর্তমান ক্যাম্পাসে দু-একটি কাঁচা বাড়ি - খড়ের ছাউনি এবং তারপরে সরকারী অনুদানের ফলে দু-একটি পাকা বাড়ি তৈরি হয়।১৯৬৭ - ৬৮ সালে আমি বাণিজ্য বিভাগের প্রথম বর্ষে ভর্তি হই। তখন কলেজের বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর।

প্রথমে কলেজটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি অনুমোদন লাভ করে এবং পরবর্তীকালে ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হয়। প্রথমে বিল্ডিং-এর অভাব থাকায় সান্ধ্যকালীন সময়ে বাণিজ্য বিভাগের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। দিবাভাগে কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের পঠন-পাঠন হতো। ১৯৬৩ সাল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে গণিতশাস্ত্রে অনার্স ও কলাবিভাগে বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ার সুযোগ চালু হয়। উক্ত সময়ে কলেজের দক্ষিণদিকে উত্তরমুখী পাকা বাড়িটির নীচলতায় অফিস ছিল। উপরে একতলায় পূর্বদিকের রুমটি ছিল অধ্যক্ষ মহাশয়ের। পশ্চিম গায়ে উপরতলায় গ্রন্থাগার ছিল। কলেজের উত্তরদিকের পুরানো বিল্ডিংটি ক্লাসরুম ছিল। পশ্চিমদিকে ইটের গাঁথনি, টিনের ছাউনি দেওয়া বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি

* প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী

রুম ছিল। পূর্বদিকে একতলা ইউ. জি. সি. বিল্ডিংটিতেও ক্লাস হতো। সেই সময় অধ্যক্ষ ছিলেন মাননীয় শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়। উনি১৯৭০ সালে অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করে হাওড়ায় নিজ বাসভবনে চলে যান। অধ্যক্ষপদ শূন্য হওয়ায় মাননীয় স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল মহাশয় Vice-Principal হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করেন। এক বৎসর পর তিনিও উক্ত পদ পরিত্যাগ করলে মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য মহাশয় Professor-in-charge হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। কয়েক মাস পরে উনিও উক্ত পদ ত্যাগ করেন। আনুমানিক১৯৭২ সাল থেকে পরিচালন সমিতির নির্বাচিত Professor-in-charge হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। প্রায় তিন বছর তিনি কলেজটির সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে ব্রতী হন। অনিবার্যকারণবশত উনিও পদত্যাগ করেন। পরে আনুমানিক ১৯৭৬ সালে পরিচালন সমিতির অনুরোধে মাননীয় শ্রী ব্রজেশচন্দ্র দাস (ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক) মহাশয় Professor-in-charge হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আনুমানিক এক বৎসর পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য উনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় পরিচালন সমিতির অনুরোধে মাননীয় শ্রী দুলালচন্দ্র মাল পুনরায় Principal (Acting) হিসাবে দায়িত্ব নেন। প্রায় ২ বৎসর যাবৎ তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন। এরপর ইতিহাস বিষয়ের অধ্যাপক ডঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় Principal (Acting)-এর দায়িত্বভার সামলান। বিশেষ কারণবশত তিনিও ঐ পদ থেকে সরে আসেন। পরিচালন সমিতির অনুরোধে শ্রদ্ধেয় দুলালবাবু পুনরায় (তৃতীয়বার) ঐ পদে অভিষিক্ত হন। এই সময় অধ্যক্ষ পদ শূন্য থাকায় কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়।

পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৯৮১ সালে সরকার মনোনীত ও নির্বাচিত অধ্যক্ষ পদে আসেন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার ব্যানার্জী মহাশয়। তখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ঘোষ মহাশয়ের সহযোগিতায় ১৩টি অফিস কর্মচারীর শূন্যপদ পূর্ণ হয়। কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই হেডক্লার্ক ছিলেন স্বর্গীয় সত্যেন কুমার পাল মহাশয়; তৎকালীন সময়ের একজন নামকরা করণিক। শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি ছিলেন অগ্রণী, অফিস সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে স্বল্প পরিসরে, অল্প কথায় সমাধা করতে পারতেন। ক্যাশ কালেকশান ও খরচ পত্রাদির দায়িত্বে ছিলেন মাননীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণপদ সরকার মহাশয়। স্বর্গীয় ও মাননীয় দুর্গাকিঙ্কর মুখার্জী ছিলেন অফিস ক্লার্ক। হিসাব বিভাগে Accountant হিসাবে ছিলেন স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় নীলরতন হাজরা মহাশয় (উচালন)। ওনার কাছেই আমি হিসাব বিভাগের যাবতীয় কাজকর্মে শিক্ষালাভ করি। ল্যাবরেটরির কাজের দায়িত্বে ছিলেন স্বর্গীয় দিলীপ কুমার দে, রাধাকৃষ্ণ সিংহ, গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী, দেহিপদ মণ্ডল প্রমুখ। গ্রন্থাগারিক ছিলেন মাননীয় অরুণ কুমার গুপ্ত মহাশয়। গ্রন্থাগারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন মাননীয় মদন কুমার দাস, নিমাইচন্দ্র পাল প্রমুখ। লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ছিলেন শিশির কুমার কুণ্ডু, প্রিন্সিপাল অফিসে ছিলেন বিমলকৃষ্ণ সেন এবং আদায়ী টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে

যাওয়ার দায়িত্বেও ছিলেন উনি। হিসাব বিভাগে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন হরিপদ ঘোষ (গোঘাট)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ সনৎ কুমার ব্যানার্জী মহাশয় কলকাতার কালীঘাট নিকটস্থ বাসভবন থেকে নিত্য যাতায়াত করতেন। অল্প সময়ে তিনি কলেজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়েছিলেন। পরে আনুমানিক ৩ বৎসরকাল উক্ত পদে থাকার পর উত্তরপাড়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে আমাদের ছেড়ে চলে যান। আবার কলেজ পরিচালনায় নানা রকম টালবাহানা চলে। এমতাবস্থায় পরিচালন সমিতির অনুরোধে প্রথমে শ্রদ্ধেয় কমলকৃষ্ণ সরকার মহাশয় Principal (Acting) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। আনুমানিক ছয় মাস পর ১৯৮৫ সালে সরকার বাহাদুরের নির্বাচিত অধ্যক্ষ হিসাবে আসেন মাননীয় ও শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। উনি পরিবারসহ কলেজের প্রিন্সিপাল কোয়ার্টারে থাকতেন। প্রথমেই তিনি কলেজের বিল্ডিং-এর কথা চিন্তা করে লাইব্রেরি বিল্ডিং-;এর দোতলা, ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরি করেন শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় সত্যসাধন চক্রবর্তী মহাশয়ের আর্থিক সহায়তায় এবং বিল্ডিং ফাণ্ড ও ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ডের ওপর ভিত্তি করে। বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু করলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে। U.G.C.-র প্রদেয় অর্থ হতে কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে তিনি ব্রতী ছিলেন। ছাত্রদরদী অধ্যক্ষ মহাশয় শুক্র ও শনিবার দুটি করে ইতিহাসের ক্লাসও নিতেন। অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির হওয়ায় অনেক আপাত অসাধ্য কাজকে সফলতা এনে দিয়েছিলেন। এ যেন তাঁর নিজ নামের সার্থকতা। দীর্ঘ প্রায় ১৮-১৯ বৎসর কলেজের গুরুদায়িত্ব পালন করার পর জয়ের মালা গলায় পরে ২০০৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি অবসর গ্রহণ করেন।

এরপর কলেজের ভাগ্যাকাশে উদয় হল আর এক দক্ষ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বের এবং তিনি হলেন বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অসীম কুমার দে মহাশয়। এই বটবৃক্ষস্বরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বও যে অসীম - তাই তো নামের সার্থকতা রাখতে ব্রতী হলেন সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে। প্রথমেই তিনি মনোনিবেশ করলেন কলেজের নথিপত্র সংশোধনের দিকে এবং বকেয়া অডিট করিয়ে বিভিন্ন বাধা বিঘ্নের অপসারণ ঘটাতে। উনি মনে করতেন কলেজের অর্থনৈতিক দিকটা পরিষ্কার না করলে কলেজকে সরকারী অনুমোদন থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এবার তিনি লক্ষ্য দিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের দিকে। বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স চালু করলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে যাবতীয় শূন্যপদে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, অফিস কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করলেন সরকারি নিয়মনীতি মেনে। বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধি পেতে লাগল। ফুলে-ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেল। বহিরাগত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ছাত্র-ছাত্রী নিবাস, শ্রেণীকক্ষ, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজে তিনি ব্রতী হলেন। অর্থনৈতিক দুরাবস্থার উন্নতির জন্য সরকারী অনুমোদন ও কলেজের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করার দিকে মন দিলেন। সুদক্ষ পরিচালন সমিতির সভাপতি, সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ নিয়ে ফিজ বৃদ্ধি করলেন। পরিচালন সমিতির মিটিং, ফিনান্স কমিটির মিটিং, অফিস

সংক্রান্ত সমস্যা, কর্মচারী সমস্যা প্রভৃতি সুদক্ষভাবে পরিচালনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করলেন। বন্যাপ্রবণ এলাকা হওয়ায় তিনি অফিস রুমটি দোতলায় নিজের পাশের রুমে স্থানান্তর করলেন এবং তাঁর রুমের বামদিকে শিক্ষকদের স্টাফরুমের ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হতে থাকলো।

প্রতি বৎসর ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিভিন্ন সেমিনার, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীসহ কলেজের পুনর্মিলন প্রথা চালু আছে। পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা, ল্যাবরেটরিতে ইনস্ট্রুমেন্টের সংখ্যা, আসবাবপত্র ইত্যাদির জন্য প্রতি বৎসর মূলধনী ব্যয় করা হয় - যা কলেজের Asset। কলেজ প্রথম শুরু থেকে প্রতিদিনের কালেকসানের টাকা ক্যাশিয়ার ও সহযোগী একজনের সাহায্যে ব্যাঙ্কে জমা করতে যেতে হত। বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় ব্যাঙ্কের দায়িত্বশীল কর্মী ও পুলিশসহ কলেজ হতে টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে জমা করার ব্যবস্থা চালু করেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ছাত্রদের ফিজ আদায়ের সুব্যবস্থা করেন। Computer চালু হওয়ার পর অফিসের কাজ কম সংখ্যক কর্মীর দ্বারাই চলে। গত কয়েক বৎসর বহু কর্মী অবসর নেওয়ার পর সরকারী কোনো নিয়োগ না থাকায় অফিসকর্মী বন্ধুদের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। এতদসত্ত্বেও কলেজের সার্বিক অগ্রগতি অব্যাহত আছে। উল্লেখ্য, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারী অনুদান ছাড়া গরীব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের স্টুডেন্ট ফাণ্ড থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থাও বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয় চালু করেন। কোনো কর্মীবন্ধুর কঠিন অসুস্থতার সময় অম্লান বদনে নিজের পরিবার স্বরূপ মনে করে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে থাকেন। আধ্যাত্মিক চেতনা থাকায় তিনি সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় মনসামাতার মন্দির নির্মাণ করেন কলেজের প্রতিবেশীদের সহায়তায়। আশেপাশে কোনো জায়গার সন্ধান পেলে তা ক্রয় করে বিল্ডিং তৈরি করার প্রবণতা এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। শুধু তাই নয়, বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে টাকাও রেখেছেন।

পরিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুদক্ষ পরিচালন সমিতি, সরকার নির্বাচিত বিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা, অফিসকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দা সকলেই মনোরম পরিবেশে মুগ্ধ হয়ে গর্বিত বোধ করছি। ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির মহীরূহ রূপের ক্রমোন্নতি হয় তারজন্য শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের কাছে বিশেষ অনুরোধ রেখে আমার লেখনীকে বিরাম দিচ্ছি।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় - অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী

পরাধীন ভারতে এমন কিছু ক্ষণজন্মা মহামানব জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে, সমাজ সংস্কারে, ধর্ম সংস্কারে ও শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এরকম কয়েকজন মণিষী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এছাড়াও এই অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে ও স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁদের ভূমিকা স্মরণীয়, সেরকম কয়েকজন ব্যক্তিত্ব হলেন - অতুল্যচরণ ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ মোদক, অনুকূল চক্রবর্তী, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। (এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'আরামবাগের গান্ধী' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কর্মস্থল আরামবাগ হলেও তিনি আরামবাগে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর আদি বাড়ি ছিল অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে।)

দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম তীরে গোঘাট থানা। পরাধীন ভারতে এখানে শিক্ষার খুব একটা প্রসার ঘটেনি। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটতে হতো কলকাতায়। কিন্তু কৃষি-প্রধান এলাকার কতজন মানুষের কলকাতায় গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করার আর্থিক সংগতি ছিল? সামান্য কয়েকজন মানুষ সব প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল ও ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও স্বীয় চেষ্টায় নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের যে অনির্বাণ দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন তা তাঁরা দীপান্বিতায় পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ভোগ বিলাসকে তাঁরা হেলায় তুচ্ছ করেছিলেন। অসহায় দরিদ্র মানুযদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিতে হবে, তাদের শিক্ষিত করতে হবে, কিন্তু এজন্য যেন তাদের শহরে যেতে না হয়, নিজ এলাকার মধ্যেই যেন তারা উচ্চশিক্ষা লাভে সক্ষম হয় - এই ছিল তাঁদের ধ্যান-জ্ঞান। এঁদের উদ্যোগে দিকে দিকে গড়ে উঠল প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণ পাঠাগার ও নৈশ বিদ্যালয়। তারপর শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐকান্তিক সহযোগিতায় কালিপুরে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল গড়ে তুললেন নেতাজী মহাবিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পিতা-মাতার নামে বেঙ্গাই গ্রামে গড়ে তুলেছিলেন অঘোরকামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়। ড. বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মস্থান কামারপুকুরে গড়ে তুলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠ এবং আনুড় গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা শিক্ষামন্দির। গ্রামের মানুষ ক্ষেত-খামারে কাজ করে, ঘরে খেয়ে, পায়ে হেঁটে কিংবা সাইকেলে চেপে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে শুরু করল।

* প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী

আজ থেকে ৭৫ বছর আগে দ্বারকেশ্বরের পশ্চিম তীরে কালিপুর গ্রামে ডাঃ পালের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্যদের বাড়িতে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। পরমেশ্বরের আশীর্বাদে, বহু মানুষের দানে, সরকারি অর্থানুকূল্যে সেই মহাবিদ্যালয় ধীরে ধীরে রূপ পরিবর্তন করে আজ হুগলী জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সুদূর অতীতে এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে ধন্য হয়েছেন এমন কিছু মানুষের স্মৃতিচারণায় জানতে পেরেছি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস। একসময় এখানে শ্রেণিকক্ষ বলতে ছিল গাছতলা, চালাঘর কিংবা খড় ও টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর। বর্ষাকালে বন্যা হতো, মাটির রাস্তায় ছিল খানাখন্দ, কোথাও বা হাঁটু সমান দঁক। শ্রেণিকক্ষে জল পড়ত। তবুও সেখানে পাঠদান চলত। হাতে গোনা চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড - এই ছিল শিক্ষা সরঞ্জাম। ছাত্রদের ছিল জ্ঞান পিপাসা। শিক্ষকরা সেই পিপাসা দূর করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। শিক্ষকতা ছিল তাঁদের কাছে ব্রত। তাই শুধু শ্রেণিকক্ষে নয়, গাছতলায় বসে কাঠি দিয়ে মাটির উপর অংক কষে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁদের আন্তরিকতার কথা বলতে গিয়ে এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ব্রজমোহন কুণ্ডুর চোখে জল চলে আসে। মনে মনে ভাবেন, 'আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন!'

ওই সমস্ত ব্রতধারী শিক্ষকরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁদের কাছে ছাত্ররা যেমন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষা পেত, তেমনই পেত মূল্যবোধের শিক্ষা, যা তাদের মনুষ্যত্বকে বিকশিত করতে সাহায্য করত। শিক্ষকরা শিক্ষকতা করে যে সামান্য পারিশ্রমিক পেতেন তা দিয়ে তাঁদের ভালোভাবে সংসার চলত না। তাঁদের আচার-আচরণ, বেশভূষা, সরলতাপূর্ণ জীবন যাপন সব কিছুই ছিল শিক্ষণীয় তথা অনুকরণীয়।

সেদিনের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে আজকের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের আসমান-জমিন ফারাক। বিশাল বিশাল তিনতলা-চারতলা অট্টালিকা, প্রত্যেকটি একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এখন আর গাছতলায় পঠন-পাঠন হয় না, হয় স্মার্ট ক্লাসরুমে। ২১টি বিষয়ে সাম্মানিক (অনার্স) ও তিনটি বিষয়ে পাস কোর্স পড়ানো হয়। এখানে বাংলা, ইংরাজী, ইতিহাস, ভূগোলের সঙ্গে সাঁওতালি, কম্পিউটার সায়েন্স এমনকি বি. বি. এ, বি. সি. এ. পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা আছে। প্রায় পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত। মহাবিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিগুলি অতি উন্নতমানের - ম্যাপ, মডেল, মাইক্রোস্কোপ ইত্যাদি অসংখ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সরঞ্জামে পূর্ণ। প্রতিটি বিভাগে আছে বিভাগীয় গ্রন্থাগার। আর আছে ৬০ হাজার মূল্যবান পুস্তক সম্বলিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগার হুগলী জেলার মধ্যে অন্যতম। ৬টি বাংলা সংবাদপত্র, ৩টি ইংরাজী সংবাদপত্র, অসংখ্য জার্নাল ও ম্যাগাজিন, চাকরির সংবাদ সম্বলিত ৬টি পত্রিকা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অসংখ্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা এখানে নিয়মিত আসে। তা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ক্রমহ্রাসমান। গ্রন্থাগারের একজন শিক্ষাকর্মী হিসাবে স্বচক্ষে দেখেছি, গত দুবছর

আগে পর্যন্ত লাইব্রেরির রিডিং রুমে এতো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করত যে, তাদের বসার জায়গা দিতে অসুবিধা হতো। কিন্তু বর্তমানে তাদের উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম, লেন্ডিং সেকশানে যদিও তা হতাশজনক নয়।

মহাবিদ্যালয়ে সুদৃশ্য অডিটোরিয়াম, দুটি ছাত্রাবাস, দুটি ছাত্রীনিবাস, খেলার মাঠ ও জিম বর্তমান। এখানে শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা যদিও কম, তবুও তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই ঘাটতি মেটাতে বদ্ধপরিকর। কখনো কখনো সন্ধ্যা ৬টা-৭টা তেও বাড়ি যেতে তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। অধ্যক্ষ মহাশয়ের ধ্যান-জ্ঞান হল এই মহাবিদ্যালয়। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা অসাধারণ। তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের জন্য যে শ্রম ও সময় দেন, তা খুব কম সংখ্যক অধ্যক্ষ দিতে পারেন। এখানে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা নেই বললেই চলে। পঠন-পাঠনও হয় যথারীতি। ছাত্র-ছাত্রীদের আচার-ব্যবহারও আমাদের মুগ্ধ করে। তবু কেন জানি না, মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার অনেক কমে গেছে। কয়েকজন শিক্ষকের ক্লাস ছাড়া অন্য সব ক্লাসে তাদের উপস্থিতি সেভাবে চোখে পড়ে না। এজন্য অনেকে মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, করোনা কালের অন-লাইন পরীক্ষা ব্যবস্থা, টিউশন-নির্ভরতা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের জন্য হতাশাকে দায়ী করেন। মহাবিদ্যালয়ে বহু উচ্চশিক্ষিত এবং পি. এইচ. ডি ডিগ্রি ধারী শিক্ষক আছেন। এ বিষয়ে শিক্ষকদেরও উদ্যোগী হতে হবে। তবে একথা ভুললে চলবে না, তখনকার দিনে শিক্ষকতা ছিল ব্রত, এখন পেশা।

বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। গত ২৬/০১/২০২৩ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ ছিল "হুগলি জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের তুলনায় অর্ধেক।" তাহলে মহাবিদ্যালয়ে ভবিষ্যতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যে বহুলাংশে কমবে একথা অনস্বীকার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ করার জন্য আমাদের কলেজে সেন্ট্রাল লাইব্রেরির উদ্যোগে কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর জন্য একটি সেল খোলা হয়েছে। সেখানে টি. সি. এসের ১০০ ঘন্টার ট্রেনিং বছরে দুবার অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। গত বছর মাহিন্দ্রা কোম্পানি ছাত্রীদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির করেছিল। এসবের ফলে বহু ছেলে-মেয়ের কর্মসংস্থান হয়। এই উদ্যোগ আরও বাড়াতে হবে। এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করে ছাত্র-ছাত্রীরা যেন শিক্ষিত হয়, প্রকৃত মানুষ হয় এবং ভবিষ্যতে তাদের কর্মসংস্থান হয়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষাই যদি শিক্ষিত যুবকের গলা টিপে ধরে তাদের আত্মশক্তির অবমাননা ঘটায়, খর্ব করে তাদের ব্যক্তিসত্তাকে, তবে সে শিক্ষার আর যাই মূল্য থাক না কেন, বাঁচার রসদ যোগাতে সে হয় সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তখনই ঘটে শিক্ষার অপমৃত্যু। যেভাবেই হোক শিক্ষাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতেই হবে - আজকের দিনে এটাই হোক আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য।

আমার চোখে নেতাজী মহাবিদ্যালয়

উদয়চাঁদ কুণ্ডু

হুগলী জেলায় আরামবাগ পৌরসভার অন্তর্গত কালিপুরে নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট। প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল। আমি এই মহাবিদ্যালয়ের বি. কম. অনার্সে ভর্তি হই ১৯৮১ সালে। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বর্গীয় সনৎ কুমার ব্যানার্জী মহাশয়। আমাদের কমার্সের অধ্যাপকরা ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় আদিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ চট্টরাজ, শশধর কোলে, দেবপ্রসাদ সামন্ত, মনিমোহন নন্দী মহোদয়গণ। ইংরাজী পড়াতেন সত্যব্রতবাবু ও রবীন্দ্রনাথবাবু মহাশয়। কমার্সের রেজাল্ট খুব ভালো হতো। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. কম-এ আমাদের কলেজের ছাত্র সবচেয়ে বেশি থাকত। কমার্সের ক্লাস হত দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। ইলেকট্রিসিটির অভাবে তখন হ্যাজাক লাইট জ্বেলে ক্লাস হত।

সেই সময় কলেজে খুব বেশি Subject-এ অনার্স ছিল না। স্বর্গীয় সনৎ কুমার ব্যানার্জী মহাশয় চলে যাবার পর অস্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বর্গীয় ড. কমলকৃষ্ণ সরকার ও অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। এরপর স্থায়ী অধ্যক্ষ হয়ে এলেন স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় (আগষ্ট, ১৯৮৫)। তখনকার কলেজের অফিসই বর্তমান ছাত্র সংসদের অফিস। এখনকার স্টুডেন্ট কর্ণার ছিল তখনকার অধ্যক্ষের অফিসঘর। মাঝের ঘর Accounts Office। ক্লাসরুম বলতে ছিল U.G .C. বিল্ডিং-এর একতলা। বর্তমানে যেটি ত্রিতল বিশিষ্ট বিজয় মোদক ভবন সেটি ছিল তখন খড়ের চালাঘর। সেগুলিতে ক্লাস হত। অনেক সময় আবার ছাগল-কুকুরও ঢুকে পড়ত। পশ্চিমদিকে ছিল টিনের শেডের ল্যাবরেটরি। বর্তমানে যেটি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ সেটি ছিল শিক্ষক মহাশয়দের Staff Room। এর পাশেই ছিল গ্রন্থাগার। উল্লেখ্য, আগে জেনারেল অফিসের উপরে ছিল Botany Laboratory। খড়ের চালা ঘরের পাশে ছিল হোস্টেল। ভাঙা ঘর, সামনে বড় ডোবা। আর ছিল দুটি আমগাছ, সেগুলি বহু স্মৃতি বহন করে। কলেজের গেট ছিল উত্তরদিকে। দুটি ছোটো জেনারেটর ভাড়ায় চলত, ইলেকট্রিসিটি অফ হয়ে গেলে। ঐ সময় স্বর্গীয় মহাদেব ঘোষ সর্বদাই দু'হাতে কালি মেখে ছোটাছুটি করত।

তারপর ২০০৩ সালের মার্চ মাসের ১লা তারিখে অধ্যক্ষ হয়ে এলেন আরামবাগের ভূমিপুত্র ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। উনি এলেন যেন আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কলেজ তৈরি করার জন্য। এক কথায় এখন এই কলেজ দেখলে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় ভাবে। উনি ম্যানেজমেন্টের লোক। কলেজটি তৈরি করলেন সুসজ্জিতভাবে। কলেজের মাঠে কোনো প্রাচীর ছিল না। উনি খেলার মাঠটিকে বাউন্ডারি দিয়ে ঘিরে দিলেন। পূর্বদিকে বালিদেওয়ানগঞ্জ রাস্তার ধারে মেনগেট করলেন। দ্বিতল U.G.C. Building টিকে তিনতলা করলেন। পূর্বতন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিজয়বাবু টিনের শেডের বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরিকে ভেঙে যে অসম্পূর্ণ

* প্রধান করণিক

দ্বিতল বিল্ডিং করেছিলেন, তাকে বর্তমান অধ্যক্ষ ত্রিতলে পরিণত করেন। বর্তমানে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যে দ্বিতল বিল্ডিং পূর্বতন অধ্যক্ষের সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল, তাকেও বর্তমান অধ্যক্ষ ত্রিতলে রূপ দেন। এছাড়াও কেমেস্ট্রি ল্যাবরেটরির পিছনে নির্মাণ করলেন আধুনিক কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট। সর্বোপরি, খেলার মাঠের উত্তরদিকে বৃহত্তর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ তাঁর সময়ের একটি গৌরবজনক কাজ। এই বিল্ডিং-এর নীচেরতলায় অবস্থিত ক্লাসরুমসহ গণিত বিভাগ, এরই পাশে সুসজ্জিত ক্যান্টিন। এই প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতলে অবস্থিত যথাক্রমে কলেজের অফিসসহ হিসাব বিভাগ, অধ্যক্ষের ঘর, শিক্ষকদের স্টাফরুম ও উপাধ্যক্ষের ঘর। আর এর সর্বোচ্চতলে অবস্থিত চারশো সিটের সুসজ্জিত ও অনেকের কাছে ঈর্ষণীয় অডিটোরিয়াম। দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার কথা চিন্তা করে অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় যে পৃথক পৃথক হোস্টেল নির্মাণের কাজ শুরু করেন, তা আরো গতিশীল হয় বর্তমান অধ্যক্ষের আমলে। উভয় অধ্যক্ষের প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ নির্মিত হয়েছে ‘নজরুল ছাত্রী নিবাস’, ‘নিবেদিতা ছাত্রীনিবাস’ (আদিবাসী ছাত্রীদের জন্য) এবং ‘বিদ্যাসাগর’ ও ‘বিদ্যার্থী ভবন’ নামে দুটি ছাত্রাবাস।

এই মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পাঠক্রম প্রবর্তনের যে ধারা স্বর্গীয় অধ্যক্ষ চিত্তপ্রিয় রায়ের সময় থেকে চলে আসছিল, তার ধারা প্রগতিশীল রূপ নেয় বর্তমান অধ্যক্ষের যোগদানের পর থেকে। তাঁর সময়ে এডুকেশন, সাঁওতালি, বি.বি.এ., বি.সি.এ., কম্পিউটার সায়েন্স, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স, মিউজিক এবং শারীরশিক্ষা ও ইলেকট্রনিক্সে পাস কোর্স এবং সর্বোপরি বাংলা বিভাগে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু হয় (২০০৮)। এছাড়া অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের আমলেই এই কলেজে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্দিরা গান্ধি জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নামে যে দুটি স্টাডি সেন্টার চালু হয়েছিল, সেগুলিকে আরো গতিশীল করে তোলা হয় বর্তমান অধ্যক্ষের সক্রিয় প্রচেষ্টায়। উল্লেখ্য, বর্তমানে এগুলির কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে ড. তিলকনাথ ঘোষ ও ড. বিশ্বনাথ গরাই (উপাধ্যক্ষ) মহাশয়গণ।

বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয়ের আমলে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, কলেজের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বেশকিছু নতুন জায়গা ক্রয় করেন। দ্বারকেশ্বর নদের ধারে বয়েজ হোস্টেলের পাশে একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও জিম তৈরি করা হয়। কলেজের সমস্ত ল্যাবরেটরিগুলির তিনি আধুনিকীকরণ ঘটান। এছাড়া কলেজে পাঠদানের জন্য যে ২৪টি বিষয় রয়েছে সেই প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট তৈরি করা হয়। এর ফলে পঠন-পাঠন যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য।

কলেজ অফিস সংলগ্ন চতুর্থতল বিশিষ্ট বর্তমান গ্রন্থাগার ভবন নিশ্চিতভাবে কলেজের গৌরব। এক্ষেত্রে অধ্যক্ষ মহাশয় এবং প্রেসিডেন্টসহ পরিচালন সমিতির সদস্যদের ভূমিকাও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, প্রায় ষাট হাজার বই, অসংখ্য জার্নাল, জেরক্স ব্যবস্থা এবং বেশকিছু কম্পিউটার।

এছাড়া, কলেজ মাঠের পূর্বদিকে বি. এম বিল্ডিং-এর নীচের তলায় অবস্থান করছে অত্যাধুনিক জল পরীক্ষা কেন্দ্র এবং শারীরশিক্ষা বিভাগ।

অধ্যক্ষ মহাশয় প্রতি বছর প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টকে Excursion-এ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। Excursion মানে শুধু বেড়ানো নয়, সঙ্গে ভালো ভালো Institute visit করতে হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় সব সময় নতুন কিছু করতে চান। কলেজে Career Councelling Cell-এর উদ্যোগে কলেজের সদ্য স্নাতকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরির ব্যবস্থা চালু আছে। কলেজ আধুনিক হলেও এর সূচনাকালের আম বাগানের স্মৃতি আজও রয়ে গেছে। অধ্যক্ষের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা এবং পরিচালন সমিতির সদিচ্ছার দরুণ হেরিটেজ বিল্ডিং-এর দোতলায় আধুনিক গেস্ট হাউস তৈরি করলেন। তাঁর আমলেই ২০০৭ এবং ২০১৫ সালে যথাক্রমে ড. পরমার্থ ঘোষ ও অধ্যাপক উদয় নন্দী কো-অর্ডিনেটর থাকাকালীন NAAC-এর মূল্যায়ন হয়। কলেজের পূর্বদিকের জমি কিনে সেখানে Platinum Jublee Building হচ্ছে। তিনতলা সাজানো বিল্ডিং। উনি ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর অবসর নেবেন। উনি কলেজে যা ছাপ রেখে গেলেন তা কেউ ভুলতে পারবে না। আমাদের কলেজের NSS ও NCC খুবই ভালো কাজ করে। বর্তমানে কলেজের যা বিল্ডিং ঘুরে দেখতে গেলে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগে।

অধ্যক্ষ মহাশয় পুরাতন ও নতুন শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সাথে নিয়ে মাঝেমধ্যে কলেজ পরিদর্শন করেন। ওনার সবথেকে বড় গুণ উনি সবাইকে সম্মান করেন এবং সবাইকে নিয়ে চলতে পারেন। উনি সবসময় পড়াশোনার ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করেন। উনি অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী সবাইকে নিয়ে কলেজ পরিচালনা করেন। ওনার নাম বিকাশ ভবন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচিত। ওনাকে প্রত্যেকে ভালোবাসেন এবং সম্মান করেন। উনি কলেজকে একটা নতুন কলেজে রূপদান করেছেন। কলেজের আরও উন্নতি হয়েছে বিগত ২০ বছরে। ছাত্র ভর্তি বেড়েছে। পরীক্ষার Result ভালো হয়েছে। 1st Class 1st-এর সংখ্যা বেড়েছে। ছাত্ররা কোন দেওয়াল লিখন করে না। যেখানে সেখানে Poster লাগায় না। নির্দিষ্ট জায়গায় Poster দেয়। কলেজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাগানের ফুলে কেউ হাত দেয় না। গাছের ফল কেউ তোলে না। সমগ্র কলেজ ফুলে-ফলে ভর্তি। এককথায় কলেজে সাধারণভাবে সুশৃঙ্খল পরিবেশ বর্তমান।

কলেজের উন্নতি করা ছাড়াও ওনার আর একটা মানবিক দিক আছে। প্রসঙ্গত বলি, ২০১৫ সালে আমার দুর্ঘটনা হয় এবং আমি কোমায় চলে যাই। সেই সময় উনি আমার পরিবারের পাশে অভিভাবকের মতো দাঁড়িয়েছিলেন বলেই আমি প্রাণ ফিরে পাই। আমি ওনার সুস্থতা কামনা করি। ওনার সময়েই আমি Accountant এবং Head Clerk হই। আমি ২০ বছর ওনার সাথে কাজ করছি। যত সমস্যাই হোক না কেন ওনার কাছে গেলে ঠিক সমাধান হয়ে যায়। আমি এবং আমার পরিবার ওনার কাছে চিরঋণী। আমি কলেজের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ঃ স্মৃতি ও সত্তায়

সুব্রত নন্দী

নেতাজী মহাবিদ্যালয় হুগলী জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৪৮ সালের ১ লা আগষ্ট ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল সহ আরো কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর হাত ধরে মহান দেশপ্রেমিক নেতাজীর নামে এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে আরামবাগ মহকুমা সহ হুগলী, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অগণিত শিক্ষার্থীদের কাছে আলোকবর্তিকা রূপে নিজেকে উন্মোচিত করে চলেছে।

জন্মলগ্নে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হলেও বর্তমানে নেতাজী মহাবিদ্যালয় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুবিদিত। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশে-বিদেশে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, উজ্জ্বল করে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানের নাম। প্রতিষ্ঠার সময় মাত্র ৯৩ জন ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে এর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার কেন্দ্র হিসেবে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। একুশটি বিষয়ে স্নাতক, সাম্মানিক ও তিনটি স্নাতক (পাসকোর্স) সহ আরও বেশ কয়েকটি কর্মমুখী কোর্সও এখানে পড়ানো হয়। এই মহাবিদ্যালয়ে বাংলা স্নাতকোত্তরেও পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে বিগত বেশ কয়েক বছর আগে (২০০৮), যা নিঃসন্দেহে কলেজের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। প্রসঙ্গত বলি যে, এই কলেজে ১৯৯৮ সালে আমি ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হই এবং এই কলেজ থেকেই ২০০১ সালে পাশ করি। ২০০৭ সাল থেকে আমি আজ অবধি রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় (রাধানগর, খানাকুল)-এ পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত আছি। কলেজ থেকে পাস করার পর অনেকবার এখানে এসেছি এবং লক্ষ্য করেছি কলেজের নানাবিধ পরিবর্তন। আমাদের সময় দেখেছি ক্লাসরুম না থাকায় খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে কয়েকটি ছোটো ছোটো খড়ের চালা ঘরের মতো ক্লাসরুম ছিল। সেগুলিতে আমাদের ক্লাস হত। এখন দেখি তিনতলা পাকা বিল্ডিং ও অসংখ্য ক্লাসরুম। প্রত্যেকটি বিষয়ের আলাদা বিভাগ, সুসজ্জিত সুবিশাল ত্রিতল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যা দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েই থাকি। ইতিহাস অনার্স পাঠক্রম শুরু হয় ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে। আগে কেবলমাত্র জেনারেল বিষয় হিসেবে ইতিহাস পড়ানো হতো এই কলেজে। ইতিহাসে অনার্স শুরু করার ক্ষেত্রে যিনি সবথেকে বেশি উদ্যোগী ছিলেন, তিনি হলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করে আসছিলেন। কিন্তু নিজের বিষয়ে অনার্স চালু না হওয়ায়

* প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

তিনি হয়তো বিশেষ খুশি ছিলেন না। উল্লেখ্য এইসময় ইতিহাসের একজন প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেশচন্দ্র দাস মহাশয় অবসর গ্রহণ করেন এবং এর পরে পরেই ১৯৯৩-এর এপ্রিলে গোপালচন্দ্র সিনহা এই কলেজে যোগদান করেন। এর দু'বছর পর তাঁর হাত ধরে ইতিহাসের অনার্স কোর্স চালু হয়। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে উন্মোচিত হয় এক নতুন দিগন্ত। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর গোপালবাবু, যাঁকে আমরা জি. এস. স্যার নামেই বেশি চিনি, তিনি দোকান থেকে কেক কিনে এনে নিজের হাতে ছাত্রদের কেক খাইয়ে শুরু করলেন ইতিহাসের অনার্স ক্লাস। জি. এস. স্যারের সেদিনের সেই উৎসাহ সহকারে পঠন-পাঠন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আজও সমানভাবে উপভোগ করে ক্লাসের মধ্যে। স্যার যখন ক্লাস নেন তখন ছাত্র-ছাত্রীরা অবাক হয়ে শোনে এবং প্রয়োজন মতো লেখে। আমাদের সামনে ইতিহাস যেন জীবন্ত বলে মনে হয়।

ইতিহাসের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, সদা হাস্যময় অথচ গম্ভীর মুখে ক্লাসে আসতেন। তাঁর মুখে গাম্ভীর্য ও কণ্ঠে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর পথ চলার ভঙ্গি ছিল দেখবার মতো। তিনি আমাদের পড়াতেন আধুনিক ইউরোপ ১৮৭১ থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। পড়াতেন চেয়ারে বসে কিন্তু প্রত্যেকের দিকে নজর থাকতো তীক্ষ্ণ। ইউরোপের ইতিহাসের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। একটানা দুটি ক্লাস করতেন তিনি। আমাদের মধ্যে কোন বিরক্তি বোধ হত না। পড়ানোর শেষে প্রশ্ন দিয়ে যেতেন। কলেজের প্রশাসনিক প্রধান হয়েও তাঁর নিয়মানুবর্তিতা ছিল যথেষ্ট। সপ্তাহে দু'দিন সঠিক সময়েই তিনি ক্লাসে আসতেন।

কলেজের ইতিহাস অনার্স প্রতিষ্ঠার সময় একমাত্র স্থায়ী অধ্যাপক ছিলেন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সিন্‌হা। কেবল নেতাজী মহাবিদ্যালয় নয়, ইতিহাস অনুরাগী ছাত্র-ছাত্রী ও পাঠক মহলে তিনি সবিশেষ পরিচিত ব্যক্তিত্ব। অসাধারণ ছাত্রদরদী এই অধ্যাপক ক্লাসের বাইরেও ছাত্রদের নানাবিধ প্রশ্ন শোনেন এবং তা সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। ক্লাসে তাঁর পড়ানোর কৌশল ছাত্র-ছাত্রীদের মুগ্ধ করে। আমাদের সময়ে কলেজে এই বিভাগে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায়, তিনি ইতিহাস জেনারেল ক্লাসে ইতিহাস অনার্সের ক্লাসও করিয়ে দিতেন, যাতে আমাদের কোন ক্লাস বন্ধ না যায়। অনার্সের ক্লাসে প্রাচীন ভারত, আদি-মধ্যযুগের ভারত ও ইংল্যান্ডের ইতিহাস পড়াতেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও তিনি ইতিহাসের অন্য শাখায় অনায়াসে ও নিজ দক্ষতায় আকর্ষণীয় করে পড়াতেন। পড়ানোর সময় বোঝানো এবং উপস্থাপনের মাধ্যমে যেন অতীতের ঘটনাকে জীবন্ত বলে মনে হতো। কলেজে পড়ার সময় থেকে আজ অবধি তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যা এক বিরাট পাওনা। আমিও একটি কলেজে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। তিনি তাঁর আশীর্বাদের হাত সবসময় আমার উপর বাড়িয়ে দেন। আশ্চর্য বিষয়, তিনি প্রত্যেক ছাত্রের রোল নম্বর পর্যন্ত মনে রাখতেন। কেউ কোনও ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে

পরের দিন খোঁজ নিতেন। কোন্ ক্লাসে, কোন্ রুমে কী পড়িয়েছেন, তাও বলে দিতেন। তাঁর কাছেই ইতিহাসের প্রথম প্রকৃত পাঠ পেয়েছিলাম। ফলে ইতিহাসের প্রতি ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। ক্লাস পাগল এই শিক্ষক মহাশয় আমার দেখা সেরা শিক্ষক। তাঁকে কখনো বিরক্ত হতে দেখিনি। আজও সমান আগ্রহে তিনি বোর্ড ওয়ার্ক করে যে কোনো জটিল বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেন। এ এক অসাধারণ কর্মদক্ষতা। ফলে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর ক্লাস করার জন্য অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। পার্শ্ববর্তী কলেজের ছেলে-মেয়েরাও মাঝে মাঝে ক্লাস করতে আসে, প্রিন্সিপালের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। উল্লেখ্য, পড়ন্ত বিকেলেও ৩.১৫ থেকে ৪.১৫ পর্যন্ত ক্লাসে আমরা উপস্থিত থাকতাম। এখনো সবাই থাকে। একজন শিক্ষক কতখানি যত্নসহকারে ক্লাস নিতেন এই সমস্ত বিষয়গুলি থেকেই তা বোঝা সম্ভব হয়।

আমরা যখন দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিকে তখন আমাদের কলেজে নতুন অধ্যাপক হিসেবে মাননীয় সুমন্ত্র দত্ত মহাশয় যোগদান করেন। তিনি আসতেন উত্তরপাড়া থেকে। আগে চাকরি করতেন ত্রিপুরায়। তিনি আসায় কলেজে শিক্ষকের অভাব কিছুটা পূরণ হল। কলেজে যোগদান করে তিনি আমাদের পড়াতেন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস, ইতালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন। তাঁর পড়ানো ও বোঝানোর কৌশল আমাদের যথেষ্ট ভালো লাগতো। যদিও কম সময়ের জন্য তাঁকে আমরা শিক্ষক রূপে পেয়েছিলাম। তবুও সেদিনের তাঁর পড়ানো আজও মনের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে। তাঁর ধীর-স্থির উপস্থাপনা আমাদের কাছে শিক্ষণীয় ছিল। তাঁর মধুর ব্যবহারও আমাদের মুগ্ধ করে। আমাদের সময় কলেজে শ্রীযুক্ত গৌতম কুমার দে নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। যাঁকে আমরা জি. ডি. স্যার নামে চিনি। তিনি ছিলেন আংশিক সময়ের শিক্ষক। তাঁর পড়ানোর কৌশল আমাদের ভালো লাগতো। বর্তমানে তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মরত। তিনি আমাদের চিন ও জাপানের ইতিহাস পড়াতেন। কলেজে পড়ার সময় থেকে আজও তাঁর সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক আছে। বর্তমানে কলেজে আরো দুজন SACT শিক্ষক আছেন। এঁরা হলেন সুজাতা রায় ও মণিশঙ্কর সরকার। উভয়েই ভালো শিক্ষক বলে শুনেছি।

আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্লাসে অধ্যাপক শক্তিপদ মান্না ও ড. প্রণব কুমার দালালের ক্লাসও আমাদের যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল। তখন আমরা একটা ক্লাসও অফ করতাম না। আজ কলেজে পড়ানোর সূত্র ধরে দেখি বহু ছাত্র কলেজের ক্লাস করতে অনীহা প্রকাশ করে। অনেকে প্রাইভেট টিউশনির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের সময়ে কলেজে ক্লাস হত যথারীতি এবং আমরা ক্লাসও করতাম খুব আগ্রহ সহকারে। প্রত্যেক শিক্ষকের সঙ্গেই আমাদের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

এই বছর অর্থাৎ ২০২৩ সাল কলেজের প্লাটিনাম জুবিলি (৭৫ বর্ষ পূর্তি) বর্ষ হিসাবে পালিত হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষটি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগ তাদের মতো

করে অনুষ্ঠান করছে। আমাদের স্যার শ্রদ্ধেয় গোপালবাবু ২০২২ সালের জুন মাসের এক সকালে আমাকে বললেন যে, কলেজের প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে একদিন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে পুনর্মিলন অনুষ্ঠান করা হবে। আমরা আনন্দিত হলাম যে, আবার কলেজের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। স্যার একদিন হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপ খুললেন। দুই শতাধিক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এই গ্রুপে যোগ দিল।

এই বছর ৪ঠা মার্চ নির্দ্ধারিত হল পুনর্মিলনের দিন। আমরা স্যারের কথামত ঠিক বেলা ১০.৩০ মিনিটে কলেজ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হলাম। স্যারেদের বক্তব্য এবং নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কলেজের অডিটোরিয়ামে শুরু হল পুনর্মিলন অনুষ্ঠান। অনেকের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রথম দু'ঘন্টা শিক্ষক মহাশয়রা তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রাক্তনীদের বক্তব্য ও স্মৃতিচারণা শুরু হল। বিকাল ৪টায় প্রাক্তনীদের একটি কমিটি গঠিত হল। তারপর জি. এস. স্যারের সমাপ্তি ভাষণের মধ্যে দিয়ে পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হল। আনন্দের বিষয় প্রত্যেক বছর প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে - এই অঙ্গীকার করা হল। আমাদের প্রিয় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক - এই কামনা করি।

আমার চোখে নেতাজী মহাবিদ্যালয়
কাজী নুরুল হামিম

সমগ্র ভারতবাসীর আবেগ, ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা, সংঘবদ্ধতা, প্রতিবাদের কণ্ঠ সমস্ত কিছু জড়িয়ে আছে একটি মহান নামের সঙ্গে, তিনি হলেন ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের উল্লেখযোগ্য কাণ্ডারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আজ আমি যে বিষয়ের উপর লিখতে বসেছি, যার সঙ্গে আমার ভালোবাসা, আবেগ, তারুণ্যের স্বপ্ন, অতীতের সুপ্ত বাসনা, ভবিষ্যতের পাথেয়, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলমন্ত্র অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তা হল নেতাজী মহাবিদ্যালয়। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বুক চিরে প্রবাহিত হয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ, এর পূর্ব তীরে আরামবাগ শহর আর পশ্চিম তীরে কালিপুর নামক গ্রামে অবস্থিত আমার আবেগের, ভালোবাসার প্রতিষ্ঠান 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' - যেটি ১৯৪৮ সালে ১লা আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আমার কাছে মনে হয়েছে, একটি ছাত্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে এবং তাকে সম্মানীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে একটি কলেজের ভূমিকা অবিসংবাদী। নতুন কিছু করার অদম্য ইচ্ছা, বুকে বড় আশা, ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্বপ্ন নিয়ে ২০০২ সালের জুলাই মাসে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমার আগমন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০০১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে এক বছর পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমার বাড়ি থেকে বর্ধমান শহরের দূরত্ব মাত্র ২৬ কিলোমিটার হলেও ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় আমার প্রথম পছন্দ হিসাবে উঠে আসে। কারণ এই কলেজের নিয়মানুবর্তিতা, পড়াশোনার পদ্ধতি ও অধ্যাপকদের সম্পর্কে বিভিন্ন কথা আমার নিকটজনদের কাছ থেকে শুনে এই কলেজকে না দেখেই - এই কলেজ সম্পর্কে একটা প্রেম আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল। শুনেছিলাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল স্যারেরা সেই সময় ছিলেন তারা প্রত্যেকেই এক একজন সেই বিষয়ের দিকপাল ও গ্রন্থপ্রণেতা। যেমন ছিলেন ইতিহাস বিভাগে ড. গোপালচন্দ্র সিনহা, তেমনি ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. প্রণব কুমার দালাল, দর্শন বিভাগে ড. বিমলেন্দু সামন্ত, ইংরাজি বিভাগে অধ্যাপক উদয় নন্দী, বাংলা বিভাগে ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায়, ভূগোলে ড. পরমার্থ ঘোষ প্রমুখ। কলা বিভাগের এই অধ্যাপকরা ছাড়াও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে অনেক নামকরা অধ্যাপক ছিলেন।

২০০5 সালে কলেজ ছেড়ে যাবার পর বিভিন্ন কারণে এই কলেজে বারে বারে এসেছি। প্রতিবারই লক্ষ্য করেছি এই কলেজ নবরূপে বিকশিত হয়ে উন্নত থেকে উন্নততর হয়েছে। এই উন্নয়নের পেছনে উল্লেখযোগ্য কাণ্ডারী হলেন এই কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। ওনার ঐকান্তিক

* প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

প্রচেষ্টা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব কলেজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনেছে। ক্যাম্পাসের পূর্ব প্রান্তে আমাদের সময়কালের প্রশাসনিক ভবন, খেলার মাঠের পূর্ব প্রান্তে নতুন বিল্ডিং-এর দ্বিতলে স্থানান্তরিত হয়েছে। তার পাশে অধ্যক্ষের রুম ও পাশে অধ্যাপকদের স্টাফ রুম সত্যিই প্রত্যেকের নজর কেড়েছে। বিল্ডিং-এর তিনতলায় অডিটোরিয়াম রুমের অভ্যন্তরিন গঠন ও সাজসজ্জা কলেজের ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই বিল্ডিং-এর নীচের তলায় ক্যান্টিনে সুস্বাদু আহার ছাত্র-ছাত্রীদের ও স্টাফদের ক্ষুধা নিবারনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়ে থাকে। কলেজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অতিথিদের থাকবার জন্য সুন্দর অতিথি নিবাস ও ছাত্রীদের জন্য সুবিশাল হোস্টেল। সকল ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য ছোট্ট লাইব্রেরি আজ বৃহত্তর আকার ধারণ করে সুবিশাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে পরিণত হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা নিজস্ব বিভাগীয় রুম ও ক্লাস রুম এবং প্রতিটি বিভাগে আলাদা আলাদা বিভাগীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা প্রমাণ দেয় এই মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনার নিজস্ব স্বতন্ত্রতা। সেইসঙ্গে কলেজে জিম, এন. সি. সি, এন. এস. এস, নৃত্য, সঙ্গীত, কলা সমস্ত কিছু বিষয়ে উন্নয়নে মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা কলেজ ছেড়ে চলে আসার পর এই অধ্যক্ষের আমলে ২০০৮ সালে কলেজের মুকুটে নতুন পালকের সংযোজন হল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে স্নাতকোত্তর স্তরে বাংলা বিভাগের রেগুলার কোর্স পড়ানোর সূত্রপাত। রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার বাইরে সুস্থ পরিবেশ পড়াশোনা করার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের নাম নথিভুক্ত করেছে এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়। মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তির প্রাক্কালে একথা গর্বের সঙ্গে বলা যায় যে, এটা এমন একটা মহাবিদ্যালয় যা দশকের পর দশক ধরে বিভিন্ন বিভাগ থেকে অনেক কৃতি ছাত্রছাত্রী গড়ে তুলেছে - যারা পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এই মহাবিদ্যালয়ের নাম গৌরবের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করেছে।

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার আগ্রহ তৈরির পাশাপাশি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দান করে প্রকৃত মানুষ হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে কলেজের প্রতিটি বিভাগের অধ্যাপকদের ভূমিকা অতুলনীয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের ইতিহাস বিভাগের সূচনা ও বিকাশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালে আমাদের মহাবিদ্যালয় থেকে প্রথম ইতিহাসে স্নাতক বিষয়ের ব্যাচ বের হয় (১৯৯৫-১৯৯৮)। আমি তথা আমাদের ব্যাচ যে বছর মহাবিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করি সেই সালটা ছিল ২০০৫। আমাদের সময়কালে প্রথম বছর আমরা বিভাগীয় অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলাম কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ ড. বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে। উনি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে উনি পরলোকে যাত্রা করেছেন। ওনার মৃত্যুর খবর শোনার পর ২০২১ সালের ১লা ডিসেম্বর ভারাক্রান্ত মনে ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে ফেসবুকে

আমি একটি পোস্ট করেছিলাম, যেটা আমি এখানে তুলে ধরছি। সেটা পড়লে আপনারা সকলে ধারণা পাবেন যে, উনি আমাদের জীবনে কতখানি ভূমিকা রেখেছিলেন। "২০০২ সালের ২৬শে জুলাই আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় (কালিপুর কলেজ)-এর ইতিহাস অনার্সের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হলো। আমরা জানতে পারলাম কলেজের যিনি প্রিন্সিপাল তিনি আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপক, শুনে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। ....। দুইদিন অপেক্ষার পর উনি প্রথম আমাদের ক্লাসে এলেন। ওনার সেই সুন্দর বাচনভঙ্গি, সর্বদা হাসিমুখ আমাদের সকলকে আপ্লুত করেছিল। উনি আমাদের সিলেবাসের ৪র্থ পেপার 'ইউরোপের রূপান্তর' পড়াতেন। ওনার পড়ানো এমনভাবে শুনতাম এবং বক্তব্যের মধ্যে হারিয়ে যেতাম, মনে হতো ইউরোপের কোন রাষ্ট্রনায়ক আমাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন। ওনার মুখের দিকে তাকালে মনে হত সবসময় উনি হাসছেন। যদিও তারপর মাত্র একবছর ওনাকে আমরা ক্লাসে পেয়েছিলাম, কারণ কালের নিয়ম অনুযায়ী তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অল্পদিনই কলেজের সমস্ত কাজে ও অনুষ্ঠানে ওনার যে নেতৃত্ব আমরা লক্ষ্য করেছিলাম ও বক্তব্য শুনেছিলাম তা আমাদের সকলকে আপ্লুত করে রেখেছিল। ....। যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন - এই কামনা করে ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি ও ওনার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।"

আর একজন অধ্যাপকের নাম অবশ্যই স্মরণীয়, তিনি হলেন বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে রত, ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা যার জন্য গর্ব অনুভব করেন তিনি শান্ত স্বভাবের সুমিষ্ট ভাষী, ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের অধ্যাপক মাননীয় ড. সুমন্ত্র দত্ত মহাশয়। সত্যিই অবাক লাগে কীভাবে ছাত্রদেরকে আপন করে নিতে হয় তা আমরা এই স্যারের কাছ থেকে শিখেছিলাম। তাঁর এই প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে একটা বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই - তা হলো আমরা ছিলাম ইতিহাস অনার্সের নতুন সিলেবাসের প্রথম ব্যাচ। তাই সেইসময় সব বিষয়ের বাংলা বই পাওয়া যেত না, তাই স্যারেরা ইংরাজি বই থেকে তথ্য তুলে এনে বাংলায় সেই বিষয়গুলো সুন্দর করে ব্যাখ্যা করতেন। মাননীয় সুমন্ত্র স্যারের ভূমিকা আমার জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওনার ক্লাস লেকচার শুনে সেগুলি টুকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুন্দর করে লিখতাম। স্যারের নির্দেশে আমি দুটি খাতা তৈরি করে সেগুলি পরিষ্কার ভাবে লিখতাম, তারপর দুটি খাতা ক্রমান্বয়ে নির্ভুল করার জন্য স্যারকে দিতাম। একটি খাতা সংশোধন হলে আবার অন্য খাতাটি সেই দিনে ওনাকে দিতাম। আশ্চর্যের বিষয় তিনি কিন্তু কখনো বিরক্ত হননি বরং ভালোবেসেই দীর্ঘদিন ধরে আমার এই উপকারটুকু করে গেছেন। অনেক ভুল ভ্রান্তি ঠিক করে দিয়েছেন, সমগ্র সিলেবাস শেষ করতে সহায়তা করেছেন। এমনভাবে স্যারের সহায়তা পেয়েছিলাম যা সত্যি অতুলনীয়। শুধু আমিই নয়, আমার কাছ থেকে অন্যান্য সকল বন্ধু-বান্ধবী সেগুলি সংগ্রহ করে লিখেছে বা জেরক্স করেছে এবং অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে। এইভাবেই এই মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা আজও ওনার কাছ থেকে একই ভাবে উপকার পেয়ে আসছে।

আমাদের বিভাগের অধ্যাপিকা হিসাবে পেয়েছিলাম অত্যন্ত সাদামাটা, ভদ্র, মৃদুভাষী মাননীয়া সুজাতা রায় মহাশয়াকে। তিনি আমাদের বাড়ির কোন নিকট আত্মীয়ের মতোই বিভিন্ন ইতিহাসের টপিক আমাদের কাছে তুলে ধরতেন, বোঝাতেন। উনি নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করতেন বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে আত্মস্থ করাতে।

এরপর আমি যে অধ্যাপকের সম্পর্কে লিখতে চলেছি তাঁর কথা হয়ত সবার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু ওনার সম্পর্কে যেটাই লিখবো তা অনেক কম লেখা হবে বলে প্রথমে লেখার সাহস দেখাতে পারিনি। ইতিহাসের বিষয়বস্তু যদি আমাদের কাছে রাত্রির গভীর অন্ধকার হয়, তাহলে উনি হলেন পূর্ণিমার পূর্ণ গোলাকার চাঁদ। আমাদের সকলের সর্বদা নমস্য ব্যক্তিত্ব মাননীয় অধ্যাপক ড. গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয়। কারণ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো কাজের চেষ্টা করা একজন হতভাগ্য ছাত্র, পড়াশোনার মূলস্রোতে ফিরে আসার পর, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মূলমন্ত্র আমার কানে তিনিই দিয়েছিলেন। প্রথম লিস্টে আমি ইতিহাসের সাম্মানিকে ভর্তি হয়ে প্রথম যেদিন ক্লাসে গেলাম, আমাদের প্রথম ক্লাস উনি নিয়েছিলেন। প্রথম ক্লাসেই আমি অভিভূত হলাম, ইতিহাসের প্রতি আমার প্রেম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। ইতিহাসকে সবসময় একটু কঠিন বিষয় বলে মনে হলেও ওনার পড়ানো দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শেখা যায়, এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইতিহাসের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

গত বছর (২০২২) শিক্ষক দিবসের দিন ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে ফেসবুকে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম, সেটা তুলে ধরলে ওনার সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। তা হলো - ''মহান মানুষের কৃতিত্ব ইতিহাসের পাতায় চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে, যা কোনদিন কেউ ভুলতে পারে না। আজকের এই শিক্ষক দিবসে এমনই এক মহান ব্যক্তিকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও শত শত প্রণাম। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে যাঁর কৃতিত্ব অশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁর সম্পর্কে লিখতে চলেছি, তাঁর সম্পর্কে লেখার ধৃষ্ঠতা আমার নেই। ....। যাক যেটা বলছিলাম অধ্যাপনাকে যিনি পেশা হিসাবে না নিয়ে নেশা হিসাবে নিয়েছিলেন ...., ছাত্র কল্যাণ ও মঙ্গল যাঁর জীবনের মূলমন্ত্র, এক কথায় ছাত্রছাত্রী অন্ত প্রাণ বলতে যা বোঝায়, ছাত্রদের স্বার্থই যাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য - শিক্ষক, অভিভাবক, পিতা, পথপ্রদর্শক,এগিয়ে চলার প্রেরণা, সঠিক পথের দিশা দানকারী হিসাবে আমাদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যের মতো মিশে গিয়ে যিনি সর্বদা ভালোবাসা, আবেগ মিশ্রিত শাসনের ছড়ি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ধরা দিয়েছেন যা তাঁর প্রতিভাকে আরও মহিমান্বিত করেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থের কথা ভেবে কলেজের মিটিং-এ বলেছেন 'আমাকে প্রথমে বলতে দেওয়া হোক, আমি বলে চলে যাই। সিদ্ধান্ত আপনারা নেন, কারণ ক্লাসে ৫৫ জন ছেলেমেয়ে বিকেল ৩.৩০ মিনিটে আমার ক্লাস করার জন্য অপেক্ষা করছে, আমাকে যেতে হবে। ওটা আমার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

- এটাই হলো ওনার বিশেষত্ব। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে তিনি এতটাই একাত্ম যে ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নাম ও রোল নং জানতেন। আমরা লক্ষ্য করেছি ক্লাসে এসে প্রায়দিনই রোল কল না করেই উনি উপস্থিত ৫০ এর অধিক ছাত্রছাত্রীদের প্রেজেন্ট দিয়ে দিয়েছেন নির্ভুলভাবে। তিনি যখন ক্লাসে ইতিহাস পড়াতেন তখন আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতাম। প্রাচীন ভারত যাঁর পড়ানোর মুল বিষয়, তিনি মধ্যযুগ, আধুনিক যুগে ভারত, এমনকি প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক যুগের ইউরোপ যখন পড়াতেন মনে হতো সেই জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছি। এটাই ওনার বিশেষত্ব যে পরপর তিনটি ক্লাসে তিন জায়গায় পড়াচ্ছেন, কোথাও প্রাচীন যুগে, কোথাও মধ্যযুগে, কোথাও আবার ইউরোপে। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি কোনও বই বা document ছাড়াই সাবলীলভাবে আগের দিনের পড়ার ঠিক পর থেকেই আবার শুরু করতেন। আমরা অবাক হয়ে যেতাম ইতিহাসের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাবলীল ও সমান অভিজ্ঞতা দেখে। তাছাড়া একই বিষয়কে কীভাবে চার-পাঁচ রকমভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা উনি দেখিয়েছেন। ইতিহাসকে কীভাবে ভালোবাসা যায়, কীভাবে অপছন্দের বিষয় হলেও ভালোলাগায় পরিণত হয়, সেটাই তিনি দশকের পর দশক শিখিয়ে গেছেন। এমনকী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররাও তাঁর ইতিহাস পড়ানো শুনতে মনোযোগী ছাত্র হিসাবে ওনার ক্লাসে বসে থাকত। আমি গর্বের সঙ্গে জানাই যে, আমার তিনবছরের কলেজ জীবনে একটি ক্লাসও আমি মিস করিনি। ওনার দুটি খণ্ডে লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্য যুগ)' প্রাচীন ভারতের উপর লেখা একটি আকর গ্রন্থ, যেটি বাংলা মাধ্যমে ইতিহাস অনার্স ও এম.এ. স্টুডেন্টদের কাছে অমুল্য সম্পদ হিসাবে বছরের পর বছর থেকে গেছে ও ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। ওনার পরিশ্রমের, ভালোবাসার ফল আজ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে ও বিদ্যালয়ে বিকশিত হয়েছে। ২০০২ থেকে ২০০৫ আরামবাগের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমাদের ইতিহাস অনার্স ব্যাচের আমার জানা ৩০ এর অধিক জন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যে শিক্ষকতায় ১২ জন। উনিই শিখিয়েছেন সাধারণ পরিবার থেকে, সাধারণ জীবন যাপন করেও কীভাবে অসাধারণ হওয়া যায়। যিনি ইচ্ছে করলেই পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ বিভাগীয় পদে যেতে পারতেন, কিন্তু শিরদাঁড়া সোজা রেখে, আত্ম মর্যাদাকে কারো কাছে নত না করে অত্যন্ত সাদামাটা জীবন যাপন করে আজও কলেজেই রয়ে গেছেন। আমি আজ যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছি বা ভবিষ্যতে যদি কোথাও প্রতিষ্ঠিত হই, সেক্ষেত্রে ওনার অবদান সর্বাগ্রে স্বীকৃত। আজকের এই মহান শিক্ষক দিবসে আমি আমার সমস্ত সহপাঠী, ওনার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে শিক্ষা জগতের এই মহান ব্যক্তিত্বকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও শতকোটি প্রণাম। উনি হলেন হুগলী জেলার আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের ইতিহাস বিভাগের প্রধান, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয়, আমার ভাষায় 'My Educational God' মাননীয়, পরম পূজনীয় অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয় (ছাত্রদের কাছে পরিচিত G. S. নামে)।"

যাইহোক এটা বলা যায় ৯০ এর দশকের আগে থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিকভাবে শিক্ষাদান করে চলেছেন। যদিও কালের নিয়মে আর কয়েকমাস পর তিনি অবসর গ্রহণ করবেন তথাপি ছাত্রছাত্রীদের হৃদয়ে সবসময় তাদের পরামর্শদাতা হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণভাবে থেকে যাবেন। ঈশ্বর ওনাকে শারীরিক সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু দান করে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে নিয়োজিত রাখুন এই প্রার্থনা আমরা সকলে সর্বদা করি।

এরপর আসি আমার সহপাঠি বন্ধু বান্ধবীদের কথায়। এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আমাদের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা মজবুত মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল। ক্লাসের মধ্যে বা ক্লাসের বাইরে সব সময় আমরা একসঙ্গেই থাকতাম এবং আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করতাম। একসঙ্গে থাকলে আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ সময় পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা হত। আমি এই মহাবিদ্যালয়ে এসে আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সফিকুল ইসলাম খানকে পেয়েছিলাম, যার সঙ্গে অটুট বন্ধন আজও আল্ট্রাটেক সিমেন্টের মতই মজবুত। দুজন এখন পেশাগত ভাবে একই পোস্টে আছি। দুজনে দুটি পৃথক উচ্চমাধ্যমিক হাই মাদ্রাসার শিক্ষক। অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে যে নামগুলি স্মৃতিপটে বড় জায়গা জুড়ে আছে, সেগুলি হল - নবমিতা, মহেশ্বর, হোসেনারা, তৃষা, শর্মিষ্ঠা, চঞ্চল, মানস, নারান, টমজেদ, সাবির, স্বদেশ, সুভাষ, কাঞ্চন (আকুই), দেবাশিস, তাপস, অনন্ত, সাবির, কালি, কৃষ্ণ, আজিজুল, মামণি, অর্পিতা, রোসেনারা, অনির্বাণ, কাঞ্চন (আরামবাগ), ইনতিয়াজ, সুমন্ত, দিব্যেন্দু, সুপ্রকাশ সহ আরও অনেকে। এদের মধ্যে অনেকেই সম্প্রতি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে (০৪/০৩/২০২৩) উপস্থিত ছিল। প্রায় সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষকতা, ব্যাঙ্কে চাকরি, সাংবাদিকতা ও ব্যবসায় অনেকে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা ও বন্ধুদের ভালোবাসা আমার জীবনের গতিকেই পাল্টে দিয়েছিল। নিজেকে নতুন করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। বিশেষ করে মাননীয় গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয়ের সেই প্রেরণামূলক বাণী - ''হামিম তোর দ্বারা হবে, তুই চেষ্টা কর, আমি একদিন দেখতে চাই যে তুই কলেজে পড়াচ্ছিস।" ওনার ইতিহাস পড়ানোর ভঙ্গিমা এবং প্রতি পদে পদে প্রেরণা এই দুটোই আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, এই মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে যারা পড়াশোনা করেছে প্রত্যেকের জীবনেই জি. এস. স্যারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কলেজ লাইফ শেষ করার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত উনি আমার মাথার ওপরে আশীর্বাদের চাদর আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। যখন আমি কলেজ থেকে অনার্স পাস করে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে আরামবাগে ফিরে এলাম, সে সময়কালে উনি আমাকে বলেছিলেন

কলেজে পড়ানোর জন্য ইন্টারভিউ দিতে। যথারীতি আমি ওনার আশীর্বাদকে সঙ্গে নিয়ে দুটি কলেজে আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে পড়ানোর সুযোগ পেয়েছিলাম। একটি হুগলী জেলার বেঙ্গাই-এ অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয় (২০০৮-২০১০) এবং দ্বিতীয়টি বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের মহাবিদ্যালয় (২০০৮-২০১৮)। কলেজে শিক্ষকতা জীবনেও স্যার আমার প্রেরণা ছিলেন। কারণ ওনার পড়ানোর টেকনিককে আয়ত্ত করেই আমি পড়াতে চেষ্টা করতাম। এক্ষেত্রে উনি আমায় প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন - ‘‘হামিম তুই যখন কলেজে পড়াতে শুরু করবি তখন নিজেকে পার্ট টাইম না ফুল টাইম এসব ভাববি না, কারণ যে ছাত্রটি তোর সামনে বসে আছে তার কাছে কিন্তু সিলেবাস ব্যাখ্যাকারী হিসাবে সব স্যারই সমান”। যথারীতি ১০ বছর কলেজে পড়ানোর পর আমি আমার একটি স্থায়ী চাকরিতে যুক্ত হই ২০১৮ সালে, একটি উচ্চ মাধ্যমিক হাই মাদ্রাসায় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসাবে। পাশাপাশি সেইসঙ্গে আমি কলেজ সার্ভিস কমিশনের রাজ্য স্তরের (State Eligibility Test) এবং জাতীয় স্তরের (National Eligibility Test) দুটি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছি। এক্ষেত্রেও ড. গোপালচন্দ্র সিনহা স্যারের প্রেরণা কাজ করেছে। ওনার প্রেরণা ছাড়া কোনদিনই এটা সম্ভব হত না। ওনার প্রেরণায় আমার মতো এই মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের অনেকেই আজ কলেজ, স্কুল, ব্যাঙ্ক সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

লেখার সর্বশেষে এখনকার ইতিহাস বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আমি একটাই পরামর্শ দিতে চাই, আশাকরি সকল প্রাক্তনী আমার সঙ্গে একমত হবেন। পরামর্শটি হল, তোমরা সঠিকভাবে নিজেকে একজন ইতিহাসের যোগ্য ছাত্র হিসাবে তৈরি করে সমাজে প্রকৃত মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হও। ইতিহাসকে কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস বিষয়ের গভীরতা অর্জন করে তোমরা এগিয়ে চলো, আমি নিশ্চিত তোমরা প্রতিষ্ঠিত হবেই। ইতিহাস থেকেও ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক সুযোগ আছে।

আমার কলেজ বেলা ...

মুরারীমোহন রায়

স্মৃতি এবং আশা হল অদ্ভুত এক বিষয়; একটি পিছনের দিকে তাকায় এবং অন্যটি সামনের দিকে। একটি আজকের, অন্যটি আগামীকালের। আমাদের মস্তিষ্কে যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়ে যায় তাই হল স্মৃতি; সে একজন চিত্রকর, যে ফেলে আসা সময়ের ছবি আঁকে (Grandma Moses : My Life's History)। মনের মণিকোঠায় যে সব ছবি আজও অমলিন, তারই টুকরো নিয়ে কলেজ জীবনের একটা কোলাজ করতে বসেছি প্রায় এক দশক কাল পরে। মজে যাওয়া ঢলকিশোরের (দ্বারকেশ্বর নদ) গা ঘেঁষে একদিকে মফঃস্বল আর অপরদিকে গ্রাম্য বসতি যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, সেখানেই পঁচাত্তরের প্রবীণ রূপে জ্ঞানযজ্ঞের যে মহামন্দির আজও সাড়ম্বরে শিক্ষার হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে চলেছে - সেই আমার কলেজ, নেতাজী মহাবিদ্যালয় (আরামবাগ)। আমি ইতিহাসের বিদ্যার্থী। আমাদের বিভাগে সেদিনের সেই বিদ্যা-ব্যস্ত দুপুরগুলো কিভাবে গড়িয়ে বিকেল হয়েছিল, আজ সেই স্মৃতি-মেদুর সময় রোমন্থন করতে বসেছি।

ইতিহাস নয়, ভূগোল পড়ার উচ্চাকাঙ্খা নিয়েই এই কলেজের ইতিহাস বিভাগে অগ্রিম ভর্তি হয়েছিলাম, যাতে পরবর্তী কাউন্সেলিং-এ সুযোগ পাই। পেয়েও ছিলাম সেই সুযোগ, চতুর্থবারে। কিন্তু ততদিনে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে, আর গোপালবাবুর (ড. গোপাল চন্দ্র সিনহা) প্রাথমিক সন্নিকর্ষে ইতিহাস পড়ার উত্তাপও আমার অনেকটাই বেড়ে গেছে। তারপর অধ্যক্ষ অসীমবাবুও (ড. অসীম কুমার দে) আমাকে রীতিমতো উৎসাহিত করলেন ইতিহাসেই থেকে যাওয়ার জন্য, তবে ভূগোলকেও জুড়ে দিলেন ইতিহাসের লেজুড় করে। এইভাবে অকস্মাৎ ইতিহাস ক্রমশ আমায় যেন পেয়ে বসলো; তারপর তিন বছরের নাতিদীর্ঘ এক অধ্যায়। সাফল্য - ব্যর্থতার চড়াই উৎরাই বেয়ে যখন স্নাতক হলাম, ততদিনে স্মৃতির সরণি বেয়ে আমার সঞ্চয় কিছু কম নয়। তারই ছোট বড়ো কণা, যা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে রয়ে গেছে, 'পুরানো সেই দিনের কথা'য় আমি আজও স্মৃতিবিধুর।

আমার কলেজ জীবনের প্রায় সর্বাংশ সময় কেটেছে, হয় ক্লাসে, নয়তো লাইব্রেরীতে। এই তিন-তিনটে বছর যে দুজন মানুষের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে, শিক্ষায় ও স্নেহে, প্রেরণায়-উদ্দীপনায় আমি বেড়ে উঠেছিলাম, তাঁরা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় দুই অধ্যাপক - ড. গোপাল চন্দ্র সিনহা এবং ড. সুমন্ত্র দত্ত। আমার কলেজ জীবনের স্মৃতিকথা জুড়ে তাঁদের প্রসঙ্গ যে ফিরে ফিরে আসবে, তা শুরুতেই স্বীকার করে নিলাম। ক্লাসের অন্দরে যাঁর উপস্থাপনা আমাকে ইতিহাসের প্রতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে প্রাণিত করেছিল তিনি হলেন

* প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

আমাদের সকলের প্রিয় গোপালবাবু। হাতে চক-ডাস্টার নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে শেষ বেঞ্চ পর্যন্ত তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। শ্রেণীকক্ষে সকলের সবটুকু মনোযোগ তিনি যেন একাই সশব্দে শুষে নিতেন। 'লিখিয়ে-পড়িয়ে এবং বুঝিয়ে' দেওয়ার সাবলীল কৌশলে তিনি সকল শিক্ষার্থীকে বশ করে নিতেন অনায়াসে। তাঁর কথায় 'গাছেরও খাবে, আবার তলারও কুড়োবে'। একজন দায়িত্ববান গৃহ-শিক্ষকের অভাব তিনি যেন পূরণ করে দিতেন শ্রেণীকক্ষের ভেতরেই। নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা এবং পাঠ্যসূচীর প্রতি এতোখানি আত্মোৎসর্গ আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আর কখনো কোন শিক্ষকের দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ''একদিন ক্লাসের জন্য এতো টাকা আমাদের দেওয়া হচ্ছে, যা একজনের মাসিক টিউশনের বেতনের অনেক বেশি; তাই আমি যদি আমার সর্বোত্তম প্রয়াস না দিই তাহলে ওপরে গিয়ে কী জবাব দেবো?" - তাঁর এই কথা আমি যতবার ভেবেছি, ততবারই আশ্চর্য হয়েছি। দায়িত্ববোধের এমন সমুচিত পাঠ আগে কেউ কখনো আমাদের দেননি। যতদুর মনে পড়ে, Edward Hallet Carr-এর - 'What is History?' - এই নিয়ে তাঁর প্রথম ক্লাস শুরু হয়। প্রথাগত মূল্যায়ন ভিত্তিক পাঠক্রমকে তিনি যেন আমাদের সামনে আতশ কাচের নীচে এনে দিতেন। 'সমাজতন্ত্র' কিংবা 'পিরেন থিসিস' এর মতো জটিল বিষয়কে অত্যন্ত সহজপাচ্য করে পরিবেশনের দক্ষতা ছিল তাঁর করায়ত্ত। তারপর, প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতো মাঝে মধ্যেই। শিক্ষক রূপে তিনি আজও আমাদের অনেকের আদর্শ। তবে, বাংলা মাধ্যমে ক্লাস হলেও অবিরত বোর্ডে লিখতেন ইংরেজিতে, যেটা আমার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে এবং ইংরাজিতে ঐতিহাসিকদের লেখা পড়তে উৎসাহিত করেছিল। তাঁর ক্লাসের পরেই সেইসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের সন্ধানে লাইব্রেরীতে গিয়ে হাজির হতাম। নিয়মিত যাতায়াতে গ্রন্থাগারিক বাসুদেববাবুর বিশেষ পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম 'গোপালবাবুর ছাত্র' হিসাবে; নিয়ম নীতির অতিরিক্ত বেশি বই পড়ার স্বাধীনতা তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

বাংলা মাধ্যমের একজন ছাত্র হিসাবে ইংরাজিতে পড়তে গিয়ে যখন বারংবার হোঁচট খাচ্ছি, তখন যিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করলেন তিনি হলেন, সুমন্ত্রবাবু। ক্লাসের থেকে ক্লাসের বাইরে আমি তাঁর সান্নিধ্য অনেক বেশি পেয়েছি। পাঠ্যসূচীর পরিখা পেরিয়ে তিনি আমাকে ইতিহাস উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন, বুঝিয়েছেন - যুদ্ধ কিংবা জয়-পরাজয়ের পরেও ইতিহাসের ব্যাপ্তি আরও কতো ব্যাপক। তাঁর কাছে মিশেল ফুকোর 'পাগলামির ইতিহাস' শুনে আমার চিন্তা চেতনার জগতে যেন ঝড় উঠেছিল সেদিন। ইতিহাসে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সবই আপেক্ষিক, ঐতিহাসিক গবেষণায় এক একটি কাপড়ের পর্দা আমাদের চোখের ওপর থেকে সরে যায়; তখন সামনে আসে আরও নতুন প্রশ্ন, তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইতিহাস আরও গভীর রহস্য-জালে জড়িয়ে যায় - এই ইতিহাস চেতনা আমি তাঁর কাছেই প্রথম পেয়েছিলাম। ইতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুশোভন সরকারের একটি কথা তিনি আমাদের প্রায়ই বলতেন - ''সিলেবাস শেষ করার

দায়িত্ব আমার নয়, আমি তোমাদের পড়াবো"। যদিও পাঠ্যক্রম শেষ হত প্রতি বছর, কিন্তু দুঃখের বিষয় - আমরা খুব কম জনই তাঁর অধ্যাপনা উপভোগ করতাম। প্রচারবিমুখ এই মানুষটিকে আমি যতো বেশি বিব্রত করেছি, তত ইতিহাসের অলিগলির অন্দরে ঢুকে গেছি, পথ চিনিয়েছেন তিনি। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর নানা প্রসঙ্গ তিনি আমাকে বেশি বলতেন; মুখোমুখি বসে আলোচনা করতাম একসাথে, চলতো তর্ক-বিতর্ক। সুমন্ত্র স্যারই আমাকে ইতিহাস দর্শনের প্রথম পাঠ দিয়েছিলেন, ক্লাসের বাইরেই, আমাদের বিভাগীয় দপ্তরে বসেই। আজও স্পষ্ট মনে আছে সেদিন ছিল শনিবার, আমরা স্যারের শেষের ক্লাসে মাত্র চারজন। আমি, শান্তি, সজল আর সুরজিৎ। আমিই বললাম স্যারকে, সিলেবাসের বাইরে কিছু পড়াতে। স্যার শুরু করলেন, অজন্তা, ইলোরা থেকে, তারপর মধ্যযুগ পেরিয়ে সে আলোচনা পৌঁছাল স্বাধীনতা-উত্তর সংসদীয় বিতর্কে; নেহেরু বনাম শ্যামাপ্রসাদ। এদিকে কখন যে সময় পেরিয়ে গেছে, আমাদের কারও কোন খেয়াল নেই। হয়তো শেষ ঘন্টা সেদিন বাজেনি; কিংবা আমরা কেউ তা শুনিনি। শুধু মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্যারের সুবিন্যস্ত সংলাপে আমরা কয়েকজন সম্মোহিত। আলোচনা পৌঁছে গেল 'অপারেশন ব্লু স্টার'-এ। আমাদের উদ্দীপনা আর উৎকণ্ঠার পারদ তখন চরমে। ঘন্টা মিনিট গুলিয়ে ততক্ষণে ৩টে ১৫। হঠাৎ সুমন্ত্রবাবুর চোখ পড়লো ঘড়িতে, চমকে উঠলেন তিনিও। তারপর বাইরে বের হলাম। কিন্তু আমাদের মনটা তখনো স্যারের ক্লাস রুমে; আরও ঘন্টার পর ঘন্টা অনায়াসে হয়তো কেটে যেতো আমাদের, এমন তন্ময় হয়ে।

বছর বছর রাজনৈতিক অরাজকতায় অন্যান্য পার্শ্ববর্তী কলেজগুলো যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে, তখনও আমরা নির্বিবাদে সুমন্ত্র স্যারের সাথে বিতর্ক করছি - আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্ব নিয়ে; কিংবা গোপালবাবুর ক্লাসে চলছে ফরাসী বিপ্লবের সুচারু বিশ্লেষণ। হয়তো বা লাইব্রেরীতে বসে এ বই - সে বই হাতড়াচ্ছি, কীভাবে কোন্ প্রশ্নে সিনিয়র দাদাটির দাদাগিরি পর্যুদস্ত করা যায় তার সেমিনারে। সেবার তো রীতিমতো হই-হই কাণ্ড। প্রভাতভূষণদা সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর সেমিনার দিতে গিয়ে কোনভাবে নেতাজী সুভাষের প্রসঙ্গ টেনে এনেছে, সকলে রীতিমতো উত্তেজিত এবং উত্তপ্ত, আমিও 'ইট-কাঠ-পাথরের' মতো দু-একটা কঠিন প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মজা দেখছি। অবশেষে গোপালবাবু সভা ভঙ্গ করে তাকে রেহাই দিলেন। পরে সুমন্ত্রবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন - সেমিনার কী? এবং আসলে তা কেমন? বিদগ্ধ অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের একটি সেমিনারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শুনিয়ে ছিলেন সেদিন। তারপর বুঝেছিলাম, আমার সেদিনের প্রশ্নগুলো বিশেষ সঙ্গত ছিল না। পরের বছর ছিল আমার পালা। গোপনে প্রস্তুতি চলছিল আগে থেকেই। তারপর যখন সেমিনারের ডাক এলো, আমি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত। ইউরোপীয় নবজাগরণের গরিমাকে লঘু করতে দিলাম এক দীর্ঘ বক্তৃতা। গোপালবাবু বারংবার সংক্ষেপ করতে বললেন; কিন্তু কে শোনে কার কথা। অবশেষে নিরস্ত হতেই হল, যখন দেখলাম কেউ কোন প্রশ্নই করল না, সকলেই নির্বিকার। সুমন্ত্রবাবুর কাছেই শোনা

অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের কথাগুলো মনে পড়ছিল - "কারও কি কোনও প্রশ্ন নেই? ... শাহজাহানের মধ্য-এশিয়া অভিযান নিয়েও নেই ... ?" যদিও সেদিন তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অবশেষে প্রশ্ন করলেন আমাদের মণিশঙ্করবাবু (মণিশঙ্কর সরকার)। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা। প্রত্যুত্তর দিতে পেরে তৃপ্তি পেয়েছিলাম খানিকটা।

এবার আমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে কিছু বলা যাক। আমি ব্যক্তিজীবনে অনেকটাই অন্তর্মুখী এবং নির্বান্ধব বলা যায়, তবে কলেজ জীবনে বন্ধু পেয়েছিলাম বেশ কিছু জন; যাদের কেউ কেউ এখনও কিছুটা অন্তরঙ্গ। ক্লাসের নিতান্ত দু/এক জনের সাথে অকিঞ্চিৎ বৈরিতা ছিল। যদিও সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ ছিল সর্বদা। নিত্য ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম - সুব্রত এবং সুরজিৎকে। তবে রাজীবের সাথে আমার বন্ধুত্ব তখন থেকেই অম্ল-মধুর। তারপর ছিল নবীন এবং আরও অনেকে, মোটের ওপর সব ছেলেদের সাথেই আমার সম্পর্ক কম-বেশি ভালই ছিল। তবে গোপালবাবু আমাকে একটু বিশেষ স্নেহ করতেন, বইপত্রের বিষয়ে কখনো কখনো অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিতেন, যা হয়তো কোন কোন বন্ধুর কাছে ছিল কিঞ্চিৎ ঈর্ষণীয়। শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন নিয়ে সেবার আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি অপ্রীতিকর দ্বন্দ্বের আবহ তৈরি হয়। আমার সমস্ত প্রস্তাব, পরিকল্পনা রাজীবরা ভেস্তে দিয়েছিল, তবে আমারও কিছু ভুল হয়েছিল সেদিন। শেষ পর্যন্ত তারাই অনুষ্ঠান উদযাপন করে, অভিমানে আমরা আর কোনও সহযোগিতা করিনি। কিন্তু এতো কিছুর মধ্যেও আমাদের মধ্যে কোনও রাজনীতির রঙ লাগেনি, রাজীবের সাথে সম্পর্কও এখনও আগের মতোই। মূলত দূর দূরান্তের গ্রামগঞ্জ থেকে এখানে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা করতে আসে, মফঃস্বল থেকে আসতো তুলনামূলক ভাবে কম জন। এই কলেজে পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ এবং বার্ষিক সাফল্যের খতিয়ান ছিল পার্শ্ববর্তী কলেজগুলির তুলনায় অনেক ওপরে, ফলে আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ অহংকার উছলে পড়ত কখনো সখনো। পাশের কলেজ থেকে কিছু কিছু ছেলে-মেয়েরা গোপালবাবুর ক্লাস করতে আসত মাঝে মধ্যে। বিভাগীয় লাইব্রেরিতে ছিল আমার অনায়াস যাতায়াত। তবে আমাদের ক্লাসে ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল যেন উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যেটা দুর্ভেদ্য নয়, তবুও আমরা কেউ কখনো সেটাকে অতিক্রম করে আর এগোই নি; শুধু উঁকি ঝুঁকি দিয়েছিলাম একটু-আধটু। আর দুজন মানুষের কথা না বললে হয়তো আমার ইতিহাস বিভাগের কথা অপূর্ণ রয়ে যাবে - অধ্যাপক মণিশঙ্কর সরকার এবং অধ্যাপিকা সুজাতা রায়। তাঁরা তখনো পদে অস্থায়ী, তবু দেখতাম সযত্নে সিলেবাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে আমাদের পড়াতেন, পরীক্ষা উপযোগী করে লেখাতেন, প্রয়োজনে একাধিকবার বোঝাতেন, কোনরকম বিরক্তি বা পক্ষপাত ছাড়াই (বর্তমানে তাঁরা স্থায়ী)। যখন শুনতাম অনেক কলেজেই অর্ধেক ক্লাসও হয় না, সিলেবাস শেষ তো দুরস্ত; আমরা সত্যই অবাক হতাম, এখনও হই।

পরিশেষে হিসেব নিকেশের পালা, যা আমার অঙ্কে মেলেনি কোনওদিন। ক্লাস, ক্লাসের বাইরে, এমনকি কলেজ জীবনের পরেও ঋণ রয়ে গেছে আকণ্ঠ, যার পরিমাপ আমার শিক্ষাজীবনে ও ব্যক্তিজীবনে অপূরণীয়। সবটুকু আজ হয়তো বলা গেলো না; বলা যায় না, যা কিছু আজও নিতান্ত ব্যক্তিগত। জীবনে সেইসব অক্ষয় স্মৃতি সম্বল করেই আশার পথে এগিয়েই চলেছি - আমার গন্তব্যে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের অবদান

সঞ্জিত মণ্ডল

মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি অন্যতম উপাদান হলো শিক্ষা। সম্পদে পরিণত হতে হলে মানুষকে কতিপয় গুণাবলীর অধিকারী হতে হয়। আর এই গুণাবলী অর্জনের উপায় হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্থাৎ প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত কাঠামোবদ্ধ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ পরিণত হয় মানব সম্পদে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, হুগলী জেলার আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে আমি এই বিষয়টির ওপরেই গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া জরুরী।

উল্লেখ্য, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তখন আরামবাগ এবং এর আশেপাশের এলাকা ছিল যথেষ্ট অনগ্রসর। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, উচ্চশিক্ষার অভাব প্রভৃতি ছিল এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে এই অঞ্চলটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছে। তবে এটা হঠাৎ করে ঘটেনি। এটা অনেক মহান নেতা ও সমাজকর্মীদের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টার ফল। এঁদের মধ্যে ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই এলাকায় বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন, যার মধ্যে অন্যতম হল নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

এই কলেজের ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতার সময়কালের প্রায় সমকালীন। ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে প্রথম নয় বছরের জন্য এটি একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৭ সালে কলেজটি ডিগ্রি কলেজে উন্নীত হয়। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলেজটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর থেকে ধীরে ধীরে কলেজটি তার বর্তমান অবস্থা ধারণ করে। যেখানে ১৯৪৮ সালে মাত্র ৯৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে এটি শুরু হয়েছিল, সেখানে এর বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের মতো। এই কলেজে বিজ্ঞান, কলা এবং বাণিজ্য বিভাগের অধীনে ২১টি অনার্স বিভাগ রয়েছে। এছাড়াও এই কলেজ উদ্ভিদ সুরক্ষা, ইলেকট্রনিক্স বিজ্ঞান, শারীরশিক্ষা এবং ছয় মাসের সার্টিফিকেট কোর্সের মতো কিছু বিরল কোর্স অধ্যয়নের সুবিধা প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিভাগে ২০০৮ সাল থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। তাছাড়া দুটি দূরশিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে - IGNOU এবং NSOU। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীরা এই স্টাডি

* প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

সেন্টারগুলিতে আসে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে। কলেজটি ২০১৫ সালে ন্যাক (NAAC) দ্বারা দ্বিতীয়বার স্বীকৃতি পায়।

কলেজের নিজস্ব একটি ত্রি-রঙা পতাকা রয়েছে, তা হলো - সবুজ, লাল এবং আকাশি নীল। সবুজ তারুণ্যের প্রাণশক্তি, লাল বীরত্ব এবং আকাশি নীল উদারতার প্রতীক। প্রতীকে খোদাই করা আছে কলেজের নাম, অবস্থান এবং প্রতিষ্ঠার বছর এবং তার নীচে শিক্ষার সোনালি নীতিবাক্য - ''শিক্ষা যা আমাদের মুক্তি দেয়'' (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে)।

কলেজটি দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে আরামবাগ পৌরসভার অভ্যন্তরে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কালিপুরে অবস্থিত। তাই নেতাজী মহাবিদ্যালয় 'কালিপুর কলেজ' নামেও পরিচিত। হুগলি জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত আরামবাগ শহর তিনটি জেলার প্রবেশদ্বার। এই তিনটি জেলা হল - বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর। এই অবস্থানগত সুবিধার জন্য আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় এই অঞ্চলের শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

এই কলেজে পড়াশোনা করতে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা কেবলমাত্র আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, আশেপাশের জেলারও অন্তর্ভুক্ত। বর্ধমান (পূর্ব), বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর (পশ্চিম) এই সমস্ত জেলা এবং আরামবাগ মহকুমার বহু দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আজ কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। কেননা এই কলেজ পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। যেমন - বিশ্ববিদ্যালয়ে উজ্জ্বল ফলাফলের ভিত্তিতে বাৎসরিক ফি মুকুব করা, ফ্রিতে কোচিং দেওয়া, কেরিয়ার কাউন্সেলিং ব্যবস্থার মাধ্যমে পঠন-পাঠন শেষে চাকরির সুযোগ করে দেওয়া প্রভৃতি। এক্ষেত্রে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহযোগিতাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই কলেজের কলা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিহাস এবং আমিও এই ইতিহাস বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্র (২০০৭-২০১০)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের সহযোগিতা এই বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে। যাইহোক সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এই কলেজের অবদান চোখে পড়ার মতো।

ওপরের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে আমি যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছি তা হল মানব সম্পদ সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের বিকাশে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নেতাজী মহাবিদ্যালয় এর ব্যতিক্রম নয়। কারণ শুধু বস্তুগত পরিকাঠামো নয়, মানবিক পরিকাঠামো বিকাশের মাধ্যমে এই মহাবিদ্যালয় আজ সত্তর বছরেরও অধিককাল ধরে সুনাগরিক তৈরিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। আজ প্লাটিনাম জুবিলি বর্ষে এই মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশ আন্তরিকভাবে কামনা করছি।

Memories of my old college life

Chhatu Tudu (Ex-Student & SACT, Dept. of Santali, Sarat Centenary College)

Many times forgetting the present makes the memories ripe. It is good to look back while moving forward in a fast-paced life. Although human life consists of happiness, sadness, laughter, crying, yet the mind-soul is filled with sweetness to remember the happiness of the past. The most interesting part of the memory for me is my college life. In fact, student life is the happiest chapter of human life and college life is the sweetest part of student life that shines in youth. The memories of the college life cover many areas of my life. I am still fascinated by that memory. It is an impeccable nostalgia! Thinking about that life still fills my heart with peace. In that, everything can be forgotten but the memories of my college life cannot be forgotten. It evokes sweet memories and unforgattable wonderful feelings.

I passed the H. S and got admission to Santali department in Netaji Mahavidyalaya, Arambagh, Hooghly under the B. U. My session was 2011-14. Many people know this college as "Kalipur College". It is situated on the shore of the river Dwarakeswar to the west of Arambagh. After a long time, came that auspicious day. First day of my college life. Classes started at 10 O-clock. I came to the class before 20 minutes. All are new faces except my friends Rupen Tudu and Pravas Mandi. Students come from different places and schools. Everyone's eyes and faces were shining with youth. The bell rang - the Prof. Kunjadas Murmu came to the first class. The class was Santali (H). After sometime the Principal came to that class and gave an advisory speech about the rules and regulations of the college and more. He advised everyone to proceed with caution to adjust themselves porperly in the college life. He asked everyone to devote themselves with deep concentration. Because a good result in college life acts as in invincible force to gain higher education. He also said that the main responsibility of the students is to build a beautiful life. The Principal's speech was brief but to the point. His significant speech seemed to me to be a beacon for the rest of my life. I imbibed mesmerized words of this magical voice. Then the class teacher came, made the roll call and looked at the entire class.

* Ex-student, Santali Dept.

The prof. exchanged greetings with everyone and got to know everyone's identity.

Class as per routine and other supporting activities started from the first day in the college. I got the companionship of teachers for almost three years. During this time many of the students became friends, who came from far away places like Bankura, Medinipur, Hooghly, Burdwan. Friends did many fun and entertaining activities including studying together. Even though I did not stay at the hostel, I still remember the joy of going there and eating with my friends. Even during the final exam of 2nd year, I was studying at teacher's mess. In those days all teachers and students ate 'Khichuri' and it was very delicious. On the other hand, I was impressed by the sincere teaching and affection of the teachers. Along the path of light shown by them, I gradually progressed towards the goal of awakening the sense of humanity. In fact, I spent my college life like a normal boy. That is why no teacher ever had to be disappointed. But I was pioneer in asking questions about any subject in the class. And the teachers mentioned it as very positive. In fact, there is no substitute for asking questions to learn more. As a result even though the college life is over, the campus, numerous friends, respected teachers - the open door of the kingdom of knowledge. I am eternally grateful to them.

I spent almost three years in my college life. This period of B.A classes will be forever blurred in my life. It was here that I got the opportunity to roam freely in the world of studies during my student life. As I got the opportunity to learn about various subjects from experienced teachers of our department, teachers of other department like Bengali, English, Philosophy and all office members, the multi-text library gave me a new world of discovery. I got a lot lof help from both departmental library and the central library. A world in which once entered one can learn the motto of humanity and at least get an idea about the true meaning of human birth. There I had the opportunity to wonder in a strange realm fo knowledge with an open mind and open eyes, which will leave an indelible mark in my mind forever. In fact, it was during my college life that I learned how to gain confidence and self-reliance. As a result, universtiy life has become quite rich. Just as the warm colseness of friends in college life made my flourishing life happy, so for the rest of my life I have been expanding my personality with the logistics of that feeling. So college life has a great impact on my prospective life.

In addition of studies, other cultural events were regularly organized in college. A few days after classes, we were welcomed through the Freshers' welcome. I came to the college and realized that the main purpose of education is to capture and nurture culture and become cultured. Cultural programme were organized in the Santali dept. on the occasions of Santali Mother Language Day, Teachers' Day, Pt. Raghunath Murmu birth day etc. Apart from these, other programme like Saraswati Puja, Independence Day, Rabindra Jayanti, Nazrul Jayanti etc were also organized in the college. Also the college authority used to organize different types of competition at different times. I was well known in my college for participating in competition and reciting poems at events. Ah! when I think aobut those days, my mind become very restless.

In the college sports were attende with great joy. Annual sports and other games competitions like Cricket, Football etc. were organized in that college. Cricket, Football, Volleyball, Carrom used to participate in whatever sport he liked in his free time. I like football and cricket the best. I used to play carrom sometimes. Some of they beer only studying, while others were only studying sports. I don't like any of that. Because the main task of students is to study. But apart from studies, it is very necessary to practice sports and culture to bring cheerfulness to the body and mind.

Everything about my college life was sweet. Once upon a time, everyone enjoyed reminiscing about student life and college life. This is feeling he / she can only realize that who has sold the precious time of his life to build a sweet sunny past. I clearly remember the year 2011-2014 when I was in the college. Remembering all those friends and my respected sirs. Remembering the Dwarakeswar river beside the college, the rows of mango trees, other trees inside the college boundary and play ground - where I spent three years of my life. In fact, I sowed the seeds of my future life in my college life, for which I have come so far today. So, I cannot forget my college life, and it is not possible anymore. Even today, when I recall my college life, so many memories of joy and pain came crowding in my heart and that sustain me in the hours of depression in the present.

স্মৃতির ক্যানভাস ঃ একটি চিঠি

শ্রেষ্ঠী দে

প্রিয় মহাবিদ্যালয়,

তুমি কুশলে আছো তো বন্ধু ? এর একটা ইতিবাচক রেশ টেনেই আমার লেখনী এগিয়ে চলুক। কারণ তুমি আজও সেই পুরোনো ছন্দে, কোলাহলপূর্ণতায় তোমার অস্তিত্ব নিশ্চয় বজায় রেখে চলেছ! তোমার সাথে দেখা হয় না বেশ কয়েকমাস হল। জানো বন্ধু, সেই কতদিন হল মেইন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের আসার অপেক্ষা করিনি কিংবা দোতলার লনে হাঁটতে হাঁটতে কোনো কাছের বন্ধুর না আসার খবর পেয়ে অভিমান করিনি। নিজের লক্ষ্যে এগোনোর প্রতিযোগিতায় চেনা বন্ধুর ভিড়ে সকলেই যেন অচেনা আজ!

জানো বন্ধু, তোমার হৃদয়ে আশ্রয় পাবার আগে পর্যন্ত একটা ভীতি মনের মধ্যে সবসময় কাজ করতো - তোমার কাছে শেষ পর্যন্ত আশ্রয়টা পাবো তো? অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে বয়ন করা স্বপ্নটা তারপর সত্যি হল একদিন। কিন্তু তোমার সাথে সম্পর্কটা আরও গভীরতর হওয়ার মুহূর্তেই ছেদ টানে লকডাউন। জানো প্রথম সেমেস্টারে ক্লাস শুরু হওয়ার পর প্রতিদিন টানা তিন-চারটে ক্লাস করতে করতে একেবারে হাঁপিয়ে উঠিনি বলব না। তাই লকডাউন প্রথম প্রথম ভালোই লাগতো। তবে সেই ভালোলাগাটা বেশিদিন স্থায়ী হল না। তোমারও নিশ্চয় তখন একা লাগতো? নাকি সকাল ন'টা থেকে চারটে পর্যন্ত বহুজনের পথ চলার শব্দ এড়িয়ে তুমি ভালোই ছিলে? গৃহবন্দী থাকতে থাকতে বন্ধুদের চেনা মুখগুলো যেন অচেনা হয়ে উঠছিল মনের ক্যানভাসে। কিন্তু যন্ত্রমাধ্যম সেইসময় সেই অচেনাকে অনেকটাই চেনার পরিসরে এনেছিল। দিনের শুরুতে ম্যামের ক্লাসে ছন্দ-অলঙ্কার পড়তে পড়তে কখন ভেসে যেতাম কবিতার সাগরে, বুঝতেই পারতাম না। কিংবা কোনো স্যার ক্লাসে সবসময় কঠিন বিষয়কে সহজ করে বুঝিয়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহস ও উৎসাহ দিতেন। আবার কোন স্যার-ম্যাডামের ক্লাসে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম। রবীন্দ্র 'গল্পগুচ্ছ' বা 'বৈষ্ণব পদাবলী'ও সমানতালে মনকে আকর্ষণ করত। রসহীন 'সাহিত্যের ইতিহাস'-এর ক্লাসও করে যেতাম ভবিষ্যতের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য। ক্লাসে 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস', 'রামায়ণ' পড়ানোর সেই চেনা চিত্র যেন মনের আরশিতে ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছিল। যন্ত্রমাধ্যমে আসলে শ্রেণিকক্ষটাকে আপন করে পাওয়া যায় না। কিন্তু শেষ কয়েক মাসে গুরু-শিষ্যের গম্ভীর সম্পর্ক নিজের অজান্তেই সহজ-সরল আর এক নিগূঢ় মানবিক সম্পর্কের স্তরে উন্নীত হয়। আজও তার রেশ স্মৃতির কুটিরে বহমান! বন্ধু তোমার যে প্রাণ চঞ্চল রূপ দেখেছিলাম, লকডাউনে তা যেন উদ্দামহীন নিস্তেজ হয়ে

* প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

পড়েছিল। কিন্তু লকডাউনের পরে আমাদের সাক্ষাতে কিছুটা দেরি হলেও সেই প্রাণচঞ্চলতা ফিরে এসেছে। তুমি আবার চির চেনা ছন্দে পথ চলতে শুরু করেছ। আমাদের নিত্য যাতায়াতে ধূলিমলিন ক্লাসঘর, বারান্দা আবার তার নিজস্ব রূপ ফিরে পায়। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুই এগিয়ে চলেছে নিজের তালে, সেই ক্লাসরুম, সেই টেবিল-চেয়ার, সেই হৈ-হুল্লোড় সবই রয়ে গেছে; বদলেছে শুধু গলার স্বর।

আমরা শুধু নিজের বিভাগের অধ্যাপকদের কাছেই প্রিয় পাত্র হয়ে উঠিনি। চলার পথে পেয়েছি অন্য বিভাগের অধ্যাপকদের স্নেহাশিস। কেননা আমরা বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী হলেও আমাদের সর্বপ্রথম পরিচয় আমরা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। বন্ধু সেখানে তোমার প্রসারতা তো অবশ্যই ছিল। আমরা এই সমস্ত অধ্যাপকদের সান্নিধ্যে এসে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকিনি। তাঁদের কাছে পেয়েছি চরিত্র ও মানস গঠনের শিক্ষা। তাঁরাই বলেছিলেন, ভালো ছাত্র কিংবা ছাত্রী হওয়ার আগে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একজন ভালো মানুষ হওয়া। আমাদের মধ্যেও তৈরি হয়েছিল সৌহার্দ্য, প্রীতিবোধ। আর যে মানুষটির কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার। যিনি তোমার-আমার সকলের অভিভাবকরূপে সামলেছেন বিভিন্ন ধরণের দায়িত্ব, দায়িত্বের চাপে আমাদের দেখভালের কোন ত্রুটি রাখেননি। পরিশ্রুত পানীয় জল থেকে খাবার ক্যান্টিন, উন্নত গ্রন্থাগার থেকে আধুনিক ক্লাসরুম - কোনো কিছুরই অভাব রাখেননি। যখন তোমার ছত্রছায়ায় সবে সবে যাতায়াত শুরু করেছি, তখন সিনিয়র দাদা-দিদিদের খুবই ভয় করতাম। কিন্তু ক্রমে সেই ভয় মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাদের স্নেহের ভাই-বোন হিসাবে কাছে টেনে নেওয়ায়। তারপর বিভাগীয় অনুষ্ঠান আয়োজনের শরিক হিসাবে তারা আমাদের সঙ্গে নিয়ে পথ চলতে শুরু করে। তারাই আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে প্রবীণ হয়ে নবীনদের আপন করে নিতে হয়। আমরাও আবার পরম্পরায় নবীনদের কাছে টেনে নিয়েছি প্রবীণ হয়ে। এই সহনশীলতা শিখিয়েছোতো তুমি, প্রিয় কলেজ আমার।

তোমার মনে আছে বন্ধু, টিফিন টাইমে আমাদের সেই মুড়ির ফিস্ট কিংবা ক্লাস শেষে লাইন দিয়ে ফুচকা খাওয়া? অথবা যখন উদরে ছুঁচোর দৌরাত্ম শুরু হয়েছে তখনই স্মৃতিতে আসে ক্যান্টিন। সেখানে বন্ধুদের সাথে কী কাণ্ডটাই না ঘটেছে - খাওয়া-দাওয়া, খুনসুটি। আবার কখনো অর্থ ভাণ্ডারে জোর না থাকায় রসনাকে সংযত করে একান্তে বসে আপাত বুদ্ধিদীপ্ত অসহায়তা নিয়ে কত হাসাহাসি না করতাম তোমার সাথে। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে তোমার সাথে ও অন্যান্য বন্ধুদের সাথে কাটিয়ে আসা দিনগুলো ছিল সত্যিই অন্যরকম।

খেলার মাঠেও অতি বিশ্বস্ত সহচর রূপে তোমার সান্নিধ্য পেয়েছি অকৃপণ ভাবে। মাঠে নানা রকম সময় কাটানোর কর্মযজ্ঞ চললেও কোণের দেবদারু গাছটার তলাটা যেন আমার-তোমার একান্ত কথোপকথনের জন্যই বরাদ্দ থাকতো। দৃষ্টি মাঠে থাকলেও আবার ক্লাসের বন্ধুরা মিলে কখনো কখনো মাঠে বসতাম রংবেরঙের

গল্পের ঝুলি খুলে। আবার কখনো অফ পিরিয়ডে বসে যেত বেসুরো গলায় গানের আসর। 'নিজস্বী' তো সেখানে আবশ্যক। সোস্যাল মিডিয়ায় সেইসব বিচিত্র ক্যাপশানওয়ালা ছবি আজ 'Only Memories'। স্মৃতির অ্যালবামে মনে হয় এভাবে তিন বছরে তিন দশকের স্মৃতির পাতা পূর্ণ করে তুমি দূরে রয়েছো বন্ধু!

তোমার অন্দরের সর্বত্র ছিল আমার অবাধ যাতায়াত। তাই কখনো কখনো চলে গেছি গ্রন্থাগারে - বইয়ের মতো আপন বন্ধু কী আর হতে পারে! গ্রন্থাগার আমাদের গল্প করা সময় কাটানোর মহৎ উপায় - সামনে খোলা বই-খাতা, নীরবে মুখোমুখি তুমি আর আমি কত পূর্ব স্মৃতি বিজড়িত কথা মনে আসে। কিন্তু নীরবতা নিয়ম লঙ্ঘনের ভয়ে বলা হত না দুজনেরই। এইসব রোমাঞ্চকর স্মৃতিতে আজও মন শিহরিত হয়।

কলেজ জীবনে যে শুধু ইন্টার্নাল বা সেমিস্টারই সব নয়, তার বাইরেও একটা জগৎ আছে - 'বন্ধুত্ব-আনন্দ-অনুষ্ঠান-খেলাধুলা'। আমাদের পড়াশোনার বাইরেও ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - প্রতিযোগিতার এক বিরাট প্রাঙ্গণ। এগুলোর মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই সুপ্ত সাংস্কৃতিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে আমরা যেমন রুচিসম্মত পোশাকে সেজে উঠতাম, তেমন তুমিও বন্ধু সেদিক থেকে কিছু কম যেতে না, সেজে উঠতে নতুন রূপে, সেই দিনগুলো সত্যিই ভোলার নয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক বা বসন্ত উৎসব যন্ত্রমাধ্যম অবশ্য ছেদ পড়তে দেয়নি তাতে লকডাউন পিরিয়ডে। প্রতিবছর অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমি কোন খেলায় শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ না করলেও সেখানে উপস্থিত থাকতাম বন্ধুদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য। খুব কাছের বন্ধুর জয়ে নিজেকে একটা অংশীদার মনে করতাম খাওয়ানোর দাবিতে। আনন্দ-অনুষ্ঠান-খেলাধূলার কথা বলতে আজও হৃদয় উদ্বেলিত হয়। বন্ধুত্ব কথাটা শুধু শব্দ হয়েই থেকে যায়নি, বাস্তবে তার সাথে মিশে ছিল এক অন্যতর ভালোবাসার পরশ, যেখানে একে অপরকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য ছিল দীর্ঘতর বেদনা। সবই আজ যেন ধুলো খাচ্ছে স্মৃতির পাতায় 'Only Memories' আর হয়তো কখনো বাস্তব হবে না। আসলে আমরা সকলে নিজের অজান্তেই কখন একটা পরিবার হয়ে উঠেছিলাম বুঝতেই পারিনি।

তোমার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলো আজ সত্যিই যেন রূপকথার গল্প। দুটো বছর করোনার কবলে কাটিয়ে ফেললেও শেষ কয়েক মাস তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক হয়েছে গাঢ় থেকে গাঢ়তর। এই কয়েকমাসে বিভাগের একটা অনুষ্ঠানও চেটেপুটে আস্বাদন করতে ছাড়িনি।

আজ আরও এক নতুন পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বন্ধুত্ব তো সীমাহীন। তাই নতুনের মধ্যে পুরাতনের আদল খুঁজে পাবার কসরত করে চলি; আর তাই পরিপূরক হিসাবে কাউকে আর পাবার আশাটাও বেঁচে থাকে মনের কোণে। যদি পাই আবার গড়ে তুলব তাকে নতুন আঙ্গিকে, আবার তাকে আশ্রয় করে রংবেরং-এর গল্পরা ডানা মেলবে। তোমার রেজিস্টারের খাতায় নাম নেই তো কী হয়েছে বন্ধু!

তোমার -আমার কথোপকথনে কোনো পূর্ণচ্ছেদ পড়তে পারে না - তা কোলন, সেমিকোলন কিংবা ধারাবাহিকতার সীমানা উত্তীর্ণ হতে পারবে না। কিন্তু বন্ধু আমার লেখনী যে আজ বিশ্রাম চাইছে। তাই এখানেই থামতে হলো আমাকে। আশা রাখি আবার দেখা হবে নতুন কোনও এক সূর্যোদয়ের ভোরে ...

ইতি -

তোমার বন্ধু

শ্রেষ্ঠী দে

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

২০১৯-২০২২

জীবনের একটি অধ্যায় ঃ নেতাজী মহাবিদ্যালয়

মৌমিতা দে

হুগলী জেলার অন্তর্গত আরামবাগ মহকুমার কালিপুর নামক স্থানে অবস্থিত 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'। এই মহাবিদ্যালয় এমন এক পুণ্যভূমিতে অবস্থিত যেখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কিংবদন্তী দেশপ্রেমিক তথা বীরযোদ্ধা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পদার্পণ করেছিলেন। তিনি বীরকণ্ঠে ভারতবর্ষের সকল মানুষদের প্রতি আবেগভরা ভালোবাসার কথা সহ আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। যা বেদবাক্যস্বরূপ আমাদের কর্ণকুহরে আজও ধ্বনিত হয়। প্রতি বছর ২৩ শে জানুয়ারি কালিপুর কলেজ তথা নেতাজী মহাবিদ্যালয় নতুন সাজে, নতুন রঙে সজ্জিত হয়। চারিদিকে থাকে উৎসবমুখর পরিবেশ, আলোকসজ্জা প্রভৃতি। নানারকম অনুষ্ঠান, যেমন - এনসিসি, প্যারেড, শ্লোগান প্র্যাকটিস, গান, আবৃত্তির চর্চা, ফুটবল খেলা প্রভৃতির প্রস্তুতি পুরোদমে চলে নভেম্বরের শেষ থেকেই। ২৩শে জানুয়ারির দিন কলেজে উৎসবের হাট বসে, তাকে আনন্দঘন করে তুলতে থাকে সকালে কলেজের পতাকা উত্তোলন, পুরো আরামবাগ জুড়ে গান, আবৃত্তি, প্যারেড সহ প্রভাতফেরী ইত্যাদি। ওইদিন কলেজে নেতাজীর জন্মবার্ষিকী হিসাব করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, আতসবাজী, বেলুন ওড়ানো প্রভৃতি নানান অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সবথেকে ভালো লাগার বিষয় হল পুরো কালিপুর সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির আওয়াজ কানে ভেসে আসে। মনের ভেতর এক শিহরণ জাগানো সুন্দর সুরের হিল্লোল সৃষ্টি হয়।

ছোটোবেলা থেকেই আত্মীয় স্বজন, বড়ো দাদা-দিদি, প্রতিবেশী প্রায় সবার মুখেই অন্যান্য কলেজের নামের সাথে কালিপুর কলেজ ওরফে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের মাহাত্ম্যর কথা কমবেশি শুনে এসেছি। স্কুলের গণ্ডি শেষ করে যখন কলেজের ফর্ম ফিলাপ শুরু করলাম তখন অন্যান্য কলেজের ফর্ম তোলার আগে প্রথমেই ফর্ম নিলাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের। কলেজে 2nd List এ ভর্তি হলাম 'বাংলা বিভাগ'-এ। অনেকদিনের সুপ্ত স্বপ্ন সেদিন সত্যি হয়েছিল। কলেজের প্রথম দিন ছিল 1st July, 2019। মায়ের সঙ্গে প্রথম কালীপুর কলেজে আসা। প্রথমদিনেই ক্লাস করে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। কলেজের 1st Class বলে কথা। আস্তে আস্তে অনেক নতুন বন্ধু পেলাম। আমার কলেজের প্রথম দিনের বান্ধবী স্নেহতি। তারপর আস্তে আস্তে সব বান্ধবী বন্ধুদের সাথে পরিচিতি ঘটল। আরেকজনের সাথে আমার কলেজের মাঝপথে আলাপ। সে হল গোধূলি। চিনতাম ওকে প্রথম দিকে তবে বন্ধুত্ব গাঢ় হল শেষের দিকে। খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠল স্নেহতি, গোধূলি।

প্রথমেই মনে আসে আমাদের কলেজের বর্তমান প্রিন্সিপাল স্যার মাননীয় ড. অসীম কুমার দে মহাশয়ের

* প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

কথা। ওনার সবার প্রতি ভালোবাসা, ধীর, শান্তগতিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে কথোপকথন ও পরামর্শদান আমাকে মোহিত করে। ওনাকে প্রথম খুব কাছ থেকে পাই আমার কলেজ জীবনে প্রথম বর্ষে (1st Sem) বার্ষিক প্রতিযোগিতায় 'আবৃত্তি'তে প্রথম পুরস্কার ওনার হাত থেকে গ্রহণ করার সময়। তখনই স্যারের সাথে কথা বলার সুযোগ পাই। এই সুযোগ আবারও পেয়েছি তৃতীয় বর্ষে বার্ষিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার নেওয়ার সময়। ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করি। কলেজের সমস্ত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপকবৃন্দ সকলেই আমাদের খুব সাহায্য করতেন। কলেজের অফিস স্টাফ সহ লাইব্রেরিয়ান, অন্যান্য কর্মীদের আমি আমাদের সকলের তরফ থেকে প্রণাম জানাই। করোনা চলাকালীন আমরা আমাদের খুব কাছের মানুষ নাজিরবাবুকে হারিয়ে ফেলি। তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি। আর যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় 'মামা' (নিরঞ্জন মালিক)। উনি আমাদের মন খারাপ থাকলে যেমন হাসাতেন আবার মন ভালো থাকলেও দ্বিগুণ হাসিয়ে দিয়ে যেতেন।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ মানেই এক আবেগের জায়গা, ভালোবাসার প্রেক্ষাগৃহ। আমাদের বাংলা বিভাগ খুব সাজানো-গোছানো। চারিদিক পুস্তকে আবৃত। বিভাগের অধ্যাপকগণ সকলেই খুব হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল মানুষ। প্রথমেই বলতে ইচ্ছে করে আমাদের বিভাগীয় প্রধান মাননীয়া শ্রীমতী সুমিতা রাণী ম্যাডামের কথা। কী অপূর্ব সুরঝঙ্কারের সহিত মাতৃস্নেহে আমাদের ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য জিজ্ঞাসার প্রভৃতি শ্লোক আমাদের পাঠদান করেছেন। খুব মনে পড়ে অরুণিমা ম্যামের কথা। মাতৃসম ভালোবাসা, প্রয়োজনে কিছুটা শাসন, অপার আহ্লাদ দিয়ে আমাদের বেঁধে রেখেছিলেন। ম্যাডামের কোকিলকণ্ঠী গলায় শাক্ত পদাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য শোনার যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা মন দিয়ে শাক্ত পদাবলীর বিভিন্ন পর্যায়গুলির মাহাত্ম্যরস চেটেপুটে আস্বাদন করেছি। তবে প্রথম বর্ষের পর আর ম্যাডামকে আমরা পেলাম না। উনি বর্তমানে ব্যারাকপুর মহাদেবানন্দ কলেজের অধ্যাপিকা।

বাংলা বিভাগের আরেকজন স্যারের কথা বলব - যিনি বড়োদাদার মতো আমাদের পাশে থেকেছেন সর্বদা। তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় পীযূষবাবু। তিনি সর্বদা আমাদের সকলকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে নির্দ্বিধায় সাহায্য করেছেন। আমাদের সকলকে সাংস্কৃতিক ও ক্রিয়ামূলক দিকে উৎসাহী করে তুলেছেন বারংবার। ওনার হাত ধরেই আমার কলেজের প্রথম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা। আমরা পেয়েছি ছকের মাধ্যমে কীভাবে সাজিয়ে পড়তে হয়, গল্পের সারাংশ কীভাবে সহজে অনুমান করা যায়, কারক, বিভক্তি, সমাস, সন্ধি নির্বাচন করার পদ্ধতি তৈরি ইত্যাদি।

আমাদের বিভাগের মাননীয় ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রুতিমধুর গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠে রামায়ণের বিভিন্ন খণ্ড উপস্থাপন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু সহ নানা গুণী মানুষদের

লেখনী খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদের।

আমাদের বিভাগের সাহিত্য অনুরাগী রোমান্টিক স্যার হিসাবে আমরা সকলে প্রদীপবাবুর নাম গ্রহণ করি। উনি আমাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মহৎকথা এত সুন্দর, সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতেন, সেখানে আমাদের মনে হত আমরা আমাদের সামনে দেখা এক সত্যিকারের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা দর্শন করছি। সেই 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার আর কুসুমের বিরহ বেদনা ও ভালোবাসার অটুট বন্ধনের কাহিনী স্যারের কণ্ঠে প্রতিদিন নতুন নতুন রূপে আমরা ফিরে পেতাম।

বাংলা পরিবারের এক অন্যতম ম্যাডাম হলেন আভা ম্যাম। যিনি সাল (খ্রিস্টাব্দ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ) তারিখ অনুযায়ী ছক আকারে আমাদের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। এছাড়া নানা উপভাষার বিভাগগুলি উদাহরণসহ বোঝানো, নানান উপন্যাস, গল্প, নিপুন দক্ষতায় আমাদের পাঠদান করেছেন।

আমরা কলেজের 1st Year (2019) এ বার্ষিক অনুষ্ঠানে যেদিন বাংলা বিভাগ প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই আনন্দের ট্রফি হাতে আমি, শিল্পাদি, স্নেহতি ডিপার্টমেন্টে হাজির। সেইদিনের সন্ধ্যায় ডিপার্টমেন্টে মমতা ম্যামের সাথে আমাদের প্রথম আলাপ হল। ম্যাডাম আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে সঠিক সময়ে ক্লাসে আসতে হয়, সময়ের পড়া সময়ে তৈরি করে নিতে হয়। এছাড়া একসাথে গান গাওয়া, সময় নিয়ে বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ, নতুন নতুন চমকপ্রদ শিক্ষণীয় স্থানের সন্ধান দেওয়া প্রভৃতি।

আমার বিভাগের বিশ্বজিৎ স্যারের পড়ানোর ধরণ আমার খুব ভালো লাগতো। স্যার আমাদের আধুনিক গল্প, কবিতা পড়াতেন। 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', 'রস', 'টোপ' সহ প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হয়তো', 'শুধু কেরানী' প্রভৃতি গল্পগুলিকে আবার নতুন রসে, নতুন আঙ্গিকে ভাবিয়ে তুলেছিলেন। উনি আমাদের নিজেদেরকে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এইসব লেখার জন্য বারংবার আগ্রহী করে তুলতেন। স্যার গল্পের জিস্টকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দিতেন। সেখান থেকে আমাদের বলতেন তোরা কী বুঝলি একে একে বল। এইভাবেই আমাদের পড়া মুখস্থ হয়ে যেত। স্যার বলতেন সাহিত্য মুখস্থ করে নয়, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে তবেই সাহিত্য রস আস্বাদন করা সম্ভব।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি খুব সুন্দর ভাবে আমাদের বুঝিয়েছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় রাজকুমারবাবু। কঠিন, রুক্ষ ভাষাকে সহজ, সাবলীলভাবে আমাদের পড়িয়েছেন। আধুনিক প্রবন্ধগুলি যখন কিছুই ঠিক করে বুঝতে পারতাম না, তখন এই প্রবন্ধগুলি রাজকুমারবাবু ও মমতা ম্যামের পড়ানোর মাধ্যমে তা খুব ভালোভাবে আমরা রপ্ত করতে পেরেছিলাম।

আমাদের বাংলা বিভাগের প্রবল রবীন্দ্রপ্রেমী, সুন্দর, দক্ষ হাতের কাজ, শিল্পী-স্যার হলেন আমাদের

কৃষ্ণবাবু। যাঁর প্রতিভাচ্ছটা আমরা দেখতে পাই আমাদের বিভাগসহ আমাদের লাইব্রেরিতে, যিনি আমাদের পড়িয়েছেন রবীন্দ্রগল্প। যা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি। তার সাথে 'অচলায়তন', 'শারদোৎসব' নাটকসহ আধুনিক যুগের লেখক, যেমন- তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমাদের পড়িয়েছেন। ওনার কণ্ঠে বাঁশির সুর আমরা সকলে শুনেছি, যা মনকে মোহিত করে তোলে।

বাংলা বিভাগের সবার প্রিয় মাননীয় শ্রী সুদীপ্ত স্যারের কথা বলতে গিয়ে বলব, উনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে পড়ার ধরণ, উন্নতমানের বইয়ের সন্ধান, কীভাবে সংগ্রহ করতে হয়। এছাড়া কত মূল্যবান অজানা, সাহিত্য তত্ত্বকথা আমরা আশীর্বাদ স্বরূপ ওনার কাছ থেকে পেয়েছি।

আমাদের বাংলা পরিবারে একে অপরের সঙ্গে আত্মার যোগসূত্র সৃষ্টি হয়। বিভাগের ছোটো ভাই-বোনদের সাথে যেমন গল্পে, মজায় সামিল হয়েছি, তেমনি পাশে পেয়েছি সিনিয়র দাদা-দিদিদের। যারা আমাদের ছোটো বোনের মতো সর্বদা আগলে রেখেছে। কলেজে অনেক অনুষ্ঠানের Practice করেছি আমরা সিনিয়র-জুনিয়র মিলে। কিন্তু কখনো মনে হয়নি দাদা-দিদিদের বা ছোটো ভাই-বোনদের সঙ্গে আমাদের মত বিরোধ-খুনসুটি চালিয়ে গেছি প্রতিটি দিন। কলেজে প্রথম বর্ষে 1st Sem. -এ আমরা পেয়েছি বার্ষিক অনুষ্ঠান (২০১৯)। সেখানে বাংলা বিভাগের সেরার সেরা হয়ে ওঠা, আবার পুনরায় (২০২২) বাংলা বিভাগ প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান পাই। আমাদের কলেজ জীবনে দেখা দুটি ট্রফি আমাদের বাংলা পরিবারের সদস্য হয়ে উঠেছে। আমরা গর্বিত আমাদের বড্ড প্রিয় বাংলা পরিবারকে পেয়ে। যেখানে একসাথে টিফিন ভাগ, মাঠে বসে বন্ধুদের সঙ্গে এগরোল খাওয়া, ক্লাসের ফাঁকে গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠা, কলেজের প্রতিটি অনুষ্ঠানে দলবেঁধে রিহার্সাল করা, আনন্দে-মজায় বন্ধুদের সাথে গল্প, দুঃখ দূর করার ওষুধ হিসাবে বন্ধুদের সাথে একরাশ হাসির দোলায় সব কষ্ট নিমেষেই দূর হয়ে যায়।

আমরা কলেজ জীবনের স্বাদ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারিনি। কারণ তার মাঝেই এসে পরে প্রবল শক্তিশালী করোনা ভাইরাস। প্রায় দু'বছর ধরে তার বিরাট দৈত্যাকার রূপ আমরা দেখতে পাই। সকল মানুষ গৃহবন্দী, সমস্ত দোকানপাট, রাস্তাঘাট লকডাউন। কত মানুষ তাঁর পরিবারের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে কোভিড-এর কবলে। কলেজে 1st Sem.-এ স্যার-ম্যাম, বন্ধুদের সাথে সরাসরি বসে ক্লাস করতে পেরেছি মুখোমুখি। তারপর 2nd Sem এর Final Exam. এর ঠিক আগেই ঘোষণা হল সমস্ত স্কুল কলেজ লকডাউন। শুরু হল আমাদের বাড়িতে বসে সময় কাটানো। প্রথমের দিকে গল্পের বই, খেলাধুলা, রান্নাবান্না, হই-হুল্লোড় করে কয়েকটা দিন কাটলো ঠিকই, তারপর শুরু হল একরাশ মন খারাপের পালা। প্রতিটি মানুষই প্রায় একাকীত্ব অনুভব করতে থাকল। অবশ্য সেইসময় বাড়ির মানুষদের সাথে অনেকবেশি সময় কাটানো যেত, ফলে মনখারাপ নিমেষে কেটে যেত। আমরা লকডাউনে বাড়িতে বসেই

অনলাইনে কলেজের ক্লাস করেছি রুটিন মেনে। আমাদের প্রতিটি ক্লাস করানো হতো। আমরা Google Meet-এ join হয়ে সেই ক্লাসগুলি করতাম। এমনকি কলেজের student meeting, Programme Meeting ও স্যার-ম্যামেরা আমাদের করিয়েছেন। আমাদের সংগৃহীত বই, তথ্য আমরা Google Classroom থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারতাম। কারণ স্যার-ম্যামেরা পড়ানোর আগে ও পরে আমাদের helpful material দিয়ে রাখতেন। এই Android Phone এর মাধ্যমেই রবীন্দ্র জয়ন্তী, ভাষা দিবস, শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন প্রভৃতি নানান নিত্যনতুন অনুষ্ঠানে গান, আবৃত্তি, নাচ, বক্তৃতার ডালি নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার সমেত সকল স্যার-ম্যামরা আমাদের Vertual Programme কে আনন্দ সহকারে সাদরে গ্রহণ করেছেন। কলেজের একদম শেষেরদিকে আমরা আবার মুখোমুখি হলে দু-একটা অনুষ্ঠান করার সৌভাগ্য হয়েছে।

আমাদের তৃতীয় বর্ষে (6th Sem.) পরীক্ষা যখন শেষ হল, তখন একবারও মনে হয়নি যে, কলেজে আর নিয়মিত ক্লাস করতে পারবো না, মন খারাপ, বন্ধুদের সাথে দেখা হবে না। বরং আমাদের পরীক্ষা শেষের পরের দিনই ছিল কলেজ থেকে শিক্ষামুলক ভ্রমণ কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের বাড়ি দর্শন, পাঁচালি দর্শন সহ আমাদের রবিঠাকুরের স্থান শান্তিনিকেতন ভ্রমণ। খুব মজা করে কাটিয়েছি। বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষামূলক ভ্রমণ ছিল এই জায়গা। আমরা তিন বন্ধু (মৌমিতা, স্নেহতি, গোধূলী) সেখানে আনন্দ উপভোগ ও কিছু শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্ত করার তাগিদে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল আমাদের কয়েকজন সহপাঠী সহ স্নেহের ভাই-বোনেরা। খাতায়-কলমে আমরা ষষ্ঠ সেমিস্টার শেষ করে দিলেও আমরা কিন্তু কলেজে আবারও গেছি। স্যার-ম্যামরা আমাদের সেই সুযোগ দিয়েছেন বারংবার। কলেজে ২২শে শ্রাবণ পালন করা ও বাংলা বিভাগের ম্যাগাজিন 'সিসৃক্ষা' উদ্বোধনে আমরা সকলে মিলে এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম। এরপর আসে সেপ্টেম্বর মাস, মানেই Teachers' Day Celebration। সেই দিনও আমরা কলেজে গিয়ে এই দিনটি উপভোগ করেছি।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় এই বৎসর ৭৫ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই পুরো একটা বছর কলেজে অনুষ্ঠিত হবে নানা ধরণের অনুষ্ঠান, যেমন - গানবাজনা, খেলাধূলা, ব্যায়াম, বাগান তৈরি, প্রতিটি বিভাগে সেমিনার উপস্থাপন করা। এছাড়া প্রতিটি বিভাগ অডিটোরিয়ামের মঞ্চে পুনর্মিলন উৎসবের আনন্দ উপভোগে সামিল হয়েছে। এক আনন্দ মুখরিত পরিবেশ, টানটান উত্তেজনা, সর্বদা মুখরিত হচ্ছে চারপাশ। শুধু একটাই আফশোষ এই ৭৫ বছর পুর্তি অনুষ্ঠানের আগেই আমরা প্রাক্তন হয়ে গেলাম। আমার কলেজ, আমার পরম আদরের জায়গা, আমার বাংলা বিভাগ আমার ভালোবাসার স্থান।

সময় সুযোগ পেলেই আবারও ঘুরে আসবো, আমার মধুর স্মৃতিমাখা নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। বাগানঘেরা কলেজের চারপাশের পরিবেশ, রেলিং দিয়ে আমাদের ছুটে বেড়ানো, কলেজে কাটানো খারাপ-ভালো সবকিছু মুহুর্তের আবারও সাক্ষী হতে চাই সেই পুরোনো ছন্দের, কোনও এক বৃষ্টিভেজা দিনে।

করোনাকালে আমার কলেজ জীবন

শাশ্বত পাল

দূর অতীতকে জীবন্ত করে, বর্তমানকে ভুলিয়ে দিতে চায় স্মৃতি। গতিময় জীবনে সামনে ক্রমাগত এগিয়ে চলার সময় পিছনে ফিরে তাকাতে ভালো লাগে। যদিও সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সমন্বয়ে মানবজীবন গড়া, তবুও তার মধ্যে থেকে অতীতের সুখের স্মৃতিচারণ করতে মন-প্রাণ মাধুর্যে ভরে ওঠে। স্মৃতিচারণের যে অধ্যায় আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়, তা হলো আমার কলেজ জীবন। বস্তুত, ছাত্রজীবন মানবজীবনের সবচেয়ে সুখময় অধ্যায় আর কলেজ জীবন হলো ছাত্রজীবনের তারুণ্যে উজ্জ্বল অনন্য মধুরতম অংশ। আপাতদৃষ্টিতে আমার কলেজ জীবন শেষ হয়েছে এই কলেজের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তির ঠিক একমাস আগে (জুন-২০২৩)। তথাপি কলেজ জীবনের স্মৃতি আমার জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, সে এক অনবদ্য নস্টালজিয়া। তাই সব ভোলা যায়, কিন্তু আমার কলেজ জীবনের স্মৃতি ভোলা যায় না। সে বড়ো মধুর স্মৃতি জাগানিয়া, চিরস্মরণীয় - অপূর্ব নিবিড় অনুভূতি। সেই স্মৃতি বিজড়িত কলেজটি হলো নেতাজী মহাবিদ্যালয়।

প্রকৃতপক্ষে এইচ. এস (H.S) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আগে পর্যন্ত কলেজজীবন সম্পর্কে আমার পরিকল্পনায় তেমন কিছু আসত না। সময়টা ছিল ২০২০, গোটা বিশ্ব তখন করোনা মহামারীর কবলে জর্জরিত। এমন সময় আমি এইচ. এস (H.S) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকেই কলেজ সম্পর্কে আমার কল্পনার ক্যানভাস জুড়ে ছড়াতে থাকে আকর্ষণ ও কৌতূহলের বিচিত্র রং। একসময় কলেজ সম্পর্কে আমার আগ্রহ ও উত্তেজনা এতটাই বেড়ে গেলো যে, কেবল মনে হতে লাগল, কবে ফল প্রকাশিত হবে, আর আমি কবে কলেজে ভর্তি হবো। অতঃপর ফল প্রকাশিত হল - আমি A+ পেয়ে উত্তীর্ণ হলাম। তারিখটা ছিল ৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সাল। পিতার নির্দেশে সেই আমার স্বপ্নের কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হলাম। বলা বাহুল্য, আমার এই কলেজের সাথে সম্পর্ক আজকের নয়, বহুকাল আগের। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের অনুরোধে আমার ছোট দাদু স্বর্গীয় পীযূষকান্তি পাল মহাশয় প্রথম গণিতশাস্ত্রে এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। শুধু তাই নয়, তিনি এই কলেজের ইন্টার মিডিয়েট (আই. এস. সি)- এ প্রথম ব্যাচের ছাত্রও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বহু ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাছাড়াও তিনি বেশ কয়েক বছর সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া আমার পিতা শ্রী শ্রীকান্ত পাল মহাশয় এই কলেজে এইচ. এস (H.S) ও বি এস সি (B. Sc.)

* প্রাক্তন ছাত্র, ইতিহাস বিভাগ

কোর্সে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে আমি এই কলেজে ইতিহাস বিভাগের ছাত্র হয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করি।

সময়টা ছিল ২০২০, করোনা ভাইরাসের প্রভাবে গোটা দুনিয়াজুড়ে যে স্থবিরতা নেমে এসেছিল, তা থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষাব্যবস্থাও। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষ ভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থার ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ায় এই স্থবিরতা চেপে বসেছিল প্রকটরূপে। স্বভাবতই, কালের নিয়মকে অগ্রাহ্য না করে আমাদের প্রথম অনলাইনে ক্লাস শুরু হয় ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২০। ক্লাসের প্রথমেই আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয় আমাদের সকলের সাথে অন্যান্য স্যারেদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বিভাগীয় প্রধান স্যার একে একে আমাদের সকলের পরিচয় নিচ্ছিলেন। এক-দুজন ছাড়া আর সবাই তখন নতুন মুখ। সবার চোখে মুখে তখন তারুণ্যের দীপ্তি ঝলমল করছিল। কলেজ জীবন আসলে স্কুল জীবনের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; যা পরবর্তী জীবনে আমার মানসিক বিকাশে সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ছাত্রছাত্রীর সাথে বন্ধুত্ব এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সান্নিধ্যের ফলে যে মনোবল ও সাহস গড়ে উঠেছিল তা আমাকে জীবনের বাস্তবতাকে চিনিয়েছে, বুঝিয়েছে বেঁচে থাকা মানে জীবনের সাথে এক বিচিত্র সংগ্রাম। একদিন অনলাইন ক্লাসে আমাদের বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্যার হঠাৎ করে একটা কথা বললেন, 'ক্লাসরুমে চক, বোর্ড ছাড়া কী ক্লাস করা যায়'। আমি স্যারের এই কথাটির সাথে ১০০ শতাংশ একমত। কারণ, প্রথাগতভাবে স্যারদের সামনে বসে বিষয়টিকে বোঝার মত ক্ষমতা এই অনলাইন ক্লাসে কোনোদিন সম্ভব না। যাইহোক, পরিস্থিতি এমনই জটিল ছিল যে, অনলাইন ক্লাসই একমাত্র পথ ছিল, যেটা শিক্ষাব্যবস্থাকে এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এইভাবে কালক্রমে আমরা করোনার প্রকোপে দুবছর অর্থাৎ প্রথম সেমিস্টার থেকে তৃতীয় সেমিস্টার পর্যন্ত অনলাইনে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম।

দীর্ঘসময়ের অপেক্ষার পর, আমরা প্রথম অফলাইন অর্থাৎ কলেজে সশরীরে ক্লাস করার সুযোগ পাই চতুর্থ সেমিস্টার থেকে। সময়টা ছিল ২০২২ এর ১৬ই মার্চ, আমার জীবনের কলেজের প্রথমদিন। তখন করোনার প্রকোপ অনেকটাই হ্রাস হয়ে গিয়েছিল। মানবজীবন ধীরে ধীরে নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যগতিতে ফিরে আসছিল। কলেজের প্রথমদিন আসলে অপরিণত মানুষ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার পালা, আত্মশিক্ষার দায়িত্বগ্রহণের প্রথম পাঠ। সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল আর প্রশান্তি ভরা সে এক আশ্চর্য দিন। মনের প্রশান্তিই যেন সেদিন ফুটে উঠেছিল প্রকৃতির মধ্যে। এতদিন বদ্ধজীবনে আবদ্ধ আমি কলেজ জীবনের নতুন উদ্যমতা ও নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশায় উন্মুখ ছিলাম। সেইসঙ্গে ছিল এক নতুন অনাস্বাদিত শিহরণ। তিনবছর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহচর্য লাভ করেছিলাম, সেই সঙ্গে তাঁদের আন্তরিকতাপূর্ণ পাঠদান ও স্নেহ আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল। তাঁদের দেখানো আলোর পথ ধরে আমি ক্রমেই মনুষ্যত্ববোধ জাগরণের

লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছি।

ছাত্রজীবনে পড়াশোনার জগতে স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ আমি কলেজ জীবনে পেয়েছিলাম। বিচিত্র বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের কাছ থেকে যেমন জানার সুযোগ পেয়েছি, তেমনি বহু গ্রন্থের আধার গ্রন্থাগার দিয়েছে নতুন জগতের সন্ধান। যে জগতে একবার প্রবেশ করলে মনুষ্যত্বের মূলমন্ত্রটি শিখে নেওয়া যায় এবং কিঞ্চিৎ হলেও মনুষ্য জন্মের যথার্থ সার্থকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। যেখানে মুক্ত মনে, খোলা চোখে বিচিত্র জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের সুযোগ পেয়েছি, যা আমৃত্যু অক্ষয় স্মৃতি হয়ে থাকবে। কলেজ জীবনে বন্ধুদের উষ্ণ সান্নিধ্য যেমন আমার বিকাশমান জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, তেমনি বাকি জীবনেও সেই অনুভূতির রসদ নিয়ে আমি আমার ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমাদের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয় ক্লাস করার সময় একটি কথা প্রায়ই বলতেন যে, 'তুমি কতটা বোঝো সেটা বড়ো কথা নয়, তুমি সবার কাছে কতটা বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে পারছ সেটাই বড়ো কথা'। তাঁর এই জাদুমাখা কণ্ঠের অমিয় বাণী আমি বিমুগ্ধ হয়ে আত্মস্থ করেছিলাম সারাজীবনের জন্য। তিনি ইতিহাসের কঠিন বিষয়গুলিকে এমন নাটকীয়ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরতেন, আমরা সেটা খুব সহজভাবে আত্মস্থ করতাম। এই বিষয়ে তাঁর একটা কথা না বললেই নয়, তিনি বলতেন, 'ইতিহাসে গল্পটাই আসল, গল্প না করলে ইতিহাসকে বোঝা যায় না'। এছাড়া ছিলেন আমার প্রিয় ড. সুমন্ত্র দত্ত স্যার। স্যারের মধ্যে এক আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি আমাদেরকে প্রথাগত শিক্ষার থেকে বহির্জগতের শিক্ষা দিতেন, যা পরবর্তী সময়ে আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। তিনি তৃতীয় সেমিস্টারে মুঘল স্থাপত্য পড়াতে গিয়ে শেরশাহ-র সাসারামের সমাধিক্ষেত্র সম্পর্কে 'আলিওয়াল খাঁ' নামক খ্যাতনামা ব্যক্তির এমন একটি অজানা তথ্য আমাদের কাছে পেশ করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে আমার স্মৃতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। এই দুই স্যার ছাড়াও সুজাতা ম্যাডাম, উদয়বাবু ও মণিশঙ্করবাবুর ক্লাসও আমাদের বেশ ভালো লাগত। ফলত, কলেজ জীবন সদ্য শেষ হয়ে গেলেও আমার মনের মাঝে চির জাগরুক হয়ে আছে সেই ক্যাম্পাস, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ - যাঁরা আমাকে পৌঁছে দিয়েছেন জ্ঞানরাজ্যের উন্মুক্ত দ্বারে। তাঁদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সর্বশেষে এটা বলা যথার্থ হবে যে, কলেজ জীবনের সবই ছিল মাধুর্য্যমণ্ডিত। পরিণত বয়সে সকলেই ছাত্রজীবনের স্মৃতিচারণ করে মানসিক আনন্দ লাভ করে। এ শুধু সেই উপলব্ধি করতে পারে, যে তার জীবনের মূল্যবান সময় বিকিয়ে গড়ে তুলেছে সোনালী অতীত। বস্তুত, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ আমি কলেজ জীবনেই বপন করেছিলাম। কলেজজীবনের কথা স্মরণ করলে আমার হৃদয়ে আনন্দ বেদনার অনেক চিত্র ফুটে ওঠে যা বিস্মৃতির অতলে স্মৃতি ভাণ্ডার হয়ে রবে অম্লান চিরকাল।

স্মৃতির ক্যানভাসে কলেজ

তৃষিকা সরকার ও আলোলিকা ভট্টাচার্য

জীবনটা বড় অদ্ভুত, যেখানে থেমে যাওয়ার কোন গল্প নেই, তেমনি হেরে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। এই হেরে যাওয়ার অভিজ্ঞতাই আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। আর এই এগিয়ে যাওয়ার নামই হল জীবন। এই এগিয়ে যাওয়ার পথে মাঝেমধ্যে পিছন ফিরে তাকাতে মন্দ লাগে না। অতীতের স্মৃতি, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা মিশ্রিত অদ্ভুত এক নস্টালজিয়া। আর এই স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়েই মানব জীবনের সবচেয়ে সুখময় অধ্যায় আমাদের সামনে ফুটে ওঠে - 'ছাত্র জীবন'। ছাত্র জীবনের অন্যতম অধ্যায় হলো কলেজ জীবন। স্কুলের গণ্ডি পার করার আগে থেকেই আমাদের মনে কলেজ নিয়ে নানা উৎসাহ, নানা আগ্রহ দেখা দেয়। পাড়ার দাদা-দিদিদের কাছে কলেজের গল্প শুনতেও বেশ ভালো লাগে। কিন্তু গল্প শুনতে শুনতেই মনের অজান্তে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি ফুটে ওঠে। এভাবে দেখতে দেখতে স্কুলের গণ্ডি পার করলাম। ২০২১ এ গোটা বিশ্ব করোনা মহামারীতে আক্রান্ত। খাঁচায় বদ্ধ পাখিকে আকাশে উড়তে দিলে সে ঠিক যতটা খুশি হত তেমনই আমাদের অর্থাৎ উঠতি কলেজ পড়ুয়াদের মনেও স্বাধীনতার রঙ লাগে। কলেজে ভর্তির জন্য ফর্ম ফিলাপ করা হয়, অনেকে আবার একাধিক কলেজেও ফর্ম ফিলাপ করে। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীই নিজের কলেজ জীবন নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। সে বিষয়ে আমি হলফ করে বলতে পারি, আমার স্বপ্ন পূর্ণতা পেয়েছে, কারণ আমি ছাত্র জীবনে যখন থেকে কলেজ কী বুঝতে শিখেছি, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে পড়ার। অবশেষে আমি নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। এখনও পর্যন্ত এই কলেজের যে স্মৃতি আমার তথা আমাদের মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত তার কিছুটা মন্দ হলেও বেশিরভাগটাই মধুর। এই মধুর স্মৃতি চারণের ফলেই দিনগুলি হয়ে ওঠে আরও সুন্দর এবং প্রাণবন্ত।

আজ আমার / আমাদের কলেজ যাওয়ার দিন। নতুন দিনের সূচনায় আমরাও তৈরি হলাম কলেজ যাওয়ার জন্য। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাস ধরলাম। প্রতিদিনের মতো বাস থেকে নেমে কলেজ মুখী একটা টোটো ধরলাম। আমার সামনে বসে থাকা সহযাত্রী খুবই বিচলিত, বোধকরি সেও একজন স্টুডেন্ট। বেঁটেখাটো চেহারার এক যুবতী-কুমারী গোছের মেয়ে, চোখে গোল ব্লু কাট চশমা, কিছুটা আমারই মতো। ফোনের কভারটা ভিজে গিয়েছে হাতের ঘামে, পা দুটো ক্রমশ কম্পমান। চোখের চাউনি অনিমেষ, কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলতে পারছে না। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করার জন্য প্রথমে আমিই শুরু করলাম -

* দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

"ফার্স্ট ইয়ার?"

"হুম!"

অর্থাৎ আমার অনুমান মন্দ ছিল না। আজ ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম দিন, তাই এতো নার্ভাস দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। ওকে দেখে আজ আমারও মনে পড়ছে সেই প্রথম দিনের কথা, সেই বিচলিত চোখ, চোখে ভয়, ভয়ে ঘাম, ঘামে ভেজা হাত ... সব মিলে যাচ্ছে হুবহু ...

আহা! চোখ বুজলেই সেদিনের কথাগুলো মনে পড়ে যায়। সেদিনও এইরকম একটা টোটো ছিলো, যার ভেতরে বসেছিলাম আমি। বুকের ভেতর হাপর পড়ছিল, আর মনে হচ্ছিল মাঝ রাস্তায় টোটোটা একবার থামলেই নেমে পড়ব। মনের ভেতর জপ করছিলাম নতুন শেখা কিছু ইংরেজি শব্দ - ফ্রেসার্স, হ্যারাশমেন্ট, ইউনিয়ন, র‍্যাগিং ইত্যাদি আরো কত কী! ইতিমধ্যে কালিপুর কলেজ নিয়ে আরও কতো কিছুই না কানে গিয়েছে। নিজেকে মনে হতে লাগল যে পুকুর থেকে কেউ যেন সমুদ্রে নিয়ে এসে ফেলেছে।

তারপর টোটো থামল।

আমি নেমে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত কাকু?"

কাকু কেমন গোঁফের ফাঁকে হেসে বললেন, "দশ।"

তাঁর হাসির কারণটা আজ আমার জানা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমি নতুন, তাই নিয়মিত রুটের ভাড়া আমার জানা নেই।

যাই হোক, স্কুল লাইফের সেই নীল-সাদা পোশাকের বালাই আর নেই, কোনোদিন রঙিন পোশাক পরে এলেও আর কেউ শাস্তি দেবে না। জানি না কেন মনের ভেতর দুঃখ ও আনন্দ একসাথে প্রকাশ পেলো। নেমেই নিঃশ্বাসে লাগল এক ধাক্কা। কলেজের ফটকে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা "নেতাজী মহাবিদ্যালয়"! এ মা কালিপুর কলেজ কই? পরে অবশ্য জানতে পারি যে একটি খুকু আর অন্যটি খুকুমণি ছাড়া আর কিছুই না। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ, দ্বিপদ থেকে অঙ্গুরিমাল হয়ে প্রথম পদক্ষেপ নিলাম। মেন গেট পার করার পরেই যা লক্ষ্য পড়ল তা হল মাঠের একপাশে এন.সি.সি-র প্যারেড চলছে। তাদের হুঙ্কার আমার কানে খানিক ধমকের মতো শোনালো। আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এরপরেই চোখ গেল কলেজ বিল্ডিং-এর দিকে। মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, এর মধ্যে কোন্ রুমে ক্লাস হচ্ছে?

এগিয়ে গিয়ে কাউকে একটা জিজ্ঞাসা করব ভাবলাম ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাসটা কোনদিকে। কিন্তু সাহসে কুলালো না। এরপরেই দেখি সামনের ভিড় থেকে একটা গুণ্ডা গোছের মেয়ে এগিয়ে আসছে আমারই দিকে। মনে মনে ভাবছি এইবারেই বোধহয় শুরু হলো র‍্যাগিং। কিন্তু দিদি অত্যন্ত নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করল -

"ফার্স্ট ইয়ার?"

আমি বললাম, ‘‘হুম।”
‘‘সোজা বামদিকে সিঁড়ি, ওপরে উঠে রুম নং ৩৮।”
আমি আনন্দিত, আর সাথে হতবাকও। এই যে সবাই বলে কালিপুর কলেজ মানেই র‍্যাগিং, হ্যারাশমেন্ট! মনে খুব বল পেয়েছিলাম সেদিন।

এরপর মাঝে কেটে গেছে আরও প্রায় দুটো বছর। আজ আমরা প্রেমিকা। আস্তে আস্তে কলেজটার প্রেমে আসক্ত হয়েছি আমরা। আজ আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে, এই পরিবারটা আমাদেরও, আমরাও এই পরিবারের সদস্যা।

আজ টোটো থেকে নেমে সেই মেয়েটাও একই সংলাপ বলল - ‘‘কতো কাকু?”
এবারও ওই টোটো চালকের মুখে সেই একই হাসি, সেই একই সংলাপ - ‘‘দশ।”

টোটো থেকে নেমে কলেজের ফটকের দিকে তাকিয়ে মেয়েটার মুখেও সেই একই ভ্যাবাচ্যাকা চাউনি। মেয়েটা আমার দিকে একবার ঘুরে তাকালো। বুঝলাম সে কি বলতে চায়। আমি বললাম -
‘‘সোজা গিয়ে বামদিকে সিঁড়ি, ওপরে উঠে ২৬ নং রুম।”
আমার কথা শুনে মেয়েটি যেন স্বস্তি পেল কিছুটা। ধীরগতিতে সে এগিয়ে গেল নিজের গন্তব্যের দিকে।

এবার আমারও এগোনোর পালা। আমার ক্লাস ১০.৩০ টায় শুরু। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মনে পড়ল বেশ কিছু পুরোনো কথা। এসে পৌঁছালাম নিজের ডিপার্টমেন্টের সামনে। যার বাঁদিকে ডিপার্টমেন্টের অফিসের দরজা আর ডানদিকে রয়েছে ডিপার্টমেন্টের নাম এবং শিলালিপি (দেওয়াল পত্রিকা)। শিলালিপিকে বাস্তবায়িত করার অভিজ্ঞতাও সুমধুর। সেই প্রথমবার সিনিয়রদের সাথে কাজ করার সুযোগ পাই। ইতিহাস আমার বরাবরই খুব পছন্দের একটি বিষয়। আজ যা বর্তমান, কাল তা অতীত। আবার অতীত থেকে আমরা বর্তমানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাই। তবে এই বিষয়ের প্রতি আমার আগ্রহের আরও একটি কারণ হল আমাদের বিভাগীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ। তাঁদের অসাধারণ বাচনভঙ্গি, শিক্ষাদানের কৌশল এবং তার সাথে মানবিক ব্যবহার আমায় বারংবার মুগ্ধ করেছে।

বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা বলতে গেলেই যাঁর কথা প্রথম মাথায় আসে তিনি হলেন বিভাগীয় প্রধান ড. গোপালচন্দ্র সিনহা মহাশয়। বেঁটে-খাটো, ছিপছিপে চেহারার এক বয়স্ক ভদ্রলোক। যাঁকে স্বাভাবিকভাবে দেখলে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই লাগে। তবে এই সাধারণের মাঝেও অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। মানুষটা সন্তান স্নেহে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেন, যাতে তারা মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। জীবনের অনেকটা সময় তিনি ব্যয় করে চলেছেন মানুষ গড়ার কাজে। তাঁর মধ্যে যেমন আছে স্নিগ্ধতা, তেমনই সমানভাবে আছে দাপট; যা এক অদ্ভুত আকর্ষণে বেঁধে ফেলে ছাত্র-ছাত্রীদের। তারপর যাঁর কথা না

বললেই নয়, তিনি হলেন অধ্যাপক সুমন্ত্র দত্ত মহাশয়। তিনি যেমন শৃঙ্খলা পরায়ণ, গম্ভীর তেমনই খুব সাহায্যকারী একজন মানুষ। আর তাঁর এই ব্যক্তিত্বই সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় একজন প্রকৃত শিক্ষকের চরিত্র ঠিক কেমন হওয়া উচিত। সমস্যায় পড়লে তিনি যেমন সাহায্য করেন, তেমনই অন্যায় করলে শাসন করতেও পিছপা হন না - এই দুইয়ের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ হলেন তিনি। এছাড়াও বিভাগীয় অধ্যাপক উদয় সাউ মহাশয়, মণিশঙ্কর সরকার মহাশয়, সুজাতা রায় মহাশয়ার অবদান অনস্বীকার্য। এনারা আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, জীবন গঠনের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। একজন শিক্ষার্থীর জীবনে সঠিক সিদ্ধান্তের পিছনে এইরকমই কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিরলস পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে। স্কুলে এক ধরণের বাঁধা ধরা জীবন কাটিয়েছি। কিন্তু কলেজের একদিকে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলা, কিন্তু অন্যদিকে স্কুলের মতো বাঁধাধরা জীবন নয়।

আমাদের বিভাগীয় শিক্ষকদের পড়ানোর ধরণ অনবদ্য। প্রথমেই বিভাগীয় প্রধান গোপালবাবুর কথা বলি - স্যারের একটা কথা সবসময় আমাদের কানে বাজে। সেটা হল - "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন"। অর্থাৎ তোমাদের ভালো করে বোঝানোটাই আমার প্রধান কাজ। তারজন্য সময় যত লাগে তা দেব আমি। তোমরা বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করো।" তারপর যে গম্ভীর স্যারের কথা বললাম - সুমন্ত্রবাবু। ওনাকে কমবেশি সবাই ভয় পায়। স্যার যখন ক্লাসে থাকেন একটা পিন পড়লেও শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এবার আসি অধ্যাপক উদয়বাবুর কথায়; তিনি আমাদের সাথে সহজ সরলভাবে মেশেন। সত্যি কথা বলতে আমরা এই স্যারের ক্লাসে দুষ্টুমিও করি। তবে এতে স্যার কখনও রেগে যান না, বরং আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। অপর একজন অধ্যাপক মণিশঙ্করবাবু। স্যার আমাদের সাথে মেশেন ঠিক একজন বন্ধুর মতো। গল্প করতে করতে হঠাৎ কোনও একজন স্টুডেন্টকে তুলে পড়া ধরা - অসম্ভব ভালো লাগে আমার। আর আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে প্রিয়, শান্তশিষ্ট সাহায্যকারী মানুষ হলেন আমাদের একমাত্র অধ্যাপিকা সুজাতা রায় মহাশয়া।

আজ অতীত আর বর্তমান মিলে এক অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে আমাদের। আমাদের সহপাঠীরাও খুব সাহায্যকারী। প্রথমদিকে সবার সাথে ভালোভাবে কথা হত না, কিন্তু এখন আমরা সবাই এক। অনেক দাদা-দিদিদের বলতে শুনেছি - সেকেন্ড ইয়ারে ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব দেখার মতো। এটা একজনের জন্য হয় না, সবাই বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিই তাই সম্ভব হয়েছে।

প্রথম প্রথম ভাবতাম কলেজ মানে শুধু পড়াশোনাই হয়, তারপর দেখি আমি ভুল। স্কুলে যেমন আমাদের অনুষ্ঠান হতো, তেমনই এখানেও অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান হয়, সরস্বতী পুজো, বসন্ত উৎসব, ফ্রেসার্স ওয়েলকাম, ফেস্ট ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক অনাবিল আনন্দ দান করে আমাদের।

কুরুক্ষেত্রে যেমন অর্জুনের রথের সারথী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, ঠিক তেমনই আমাদের কলেজরূপী রথের

সারথী হলেন প্রিন্সিপাল স্যার ড. অসীম কুমার দে মহাশয়। স্যারের সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয়নি কখনো, কারণ তিনি খুবই ব্যস্ত মানুষ। তবে কিছু অনুষ্ঠানে স্যারকে দেখেছি, তাতে আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় - উনি পারবেন কলেজকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে। ওনার ব্যক্তিত্বই ওনার পরিচয়।

আমার ভবিষ্যৎ কী! তা হয়তো আমার জানা নেই, তবে আমি পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন, স্মৃতির ক্যানভাসে এই কলেজ জীবনের চিত্র অমলিন থেকে যাবে। সময় অনেকটা বালির মতো, যাকে আঁকড়ে ধরার কোনও উপায় নেই। তাই হয়তো আমরা খড়কুটোর মতো স্মৃতিকেই আঁকড়ে ধরতে চাই। ফেলে আসা দিনগুলি হয়তো ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, মানুষ বর্তমানেই বাঁচে। তবে কোথাও না কোথাও স্মৃতির ক্যানভাসে আঁকা এই সুন্দর মিষ্টি মুহূর্তগুলো আমরা উপভোগ করি অনুভবে ও কল্পনায়। হয়তো কলেজে পুনরায় ফিরে আসার মতো সৌভাগ্য আমাদের নাও হতে পারে, তাই যে কটাদিন সুযোগ আছে, তার সবটুকু গ্রহণ করতে চাই প্রাণভরে। জীবনের পাতায় লিখে রাখা এক অদ্ভুত নান্দনিক মুহূর্ত এই কলেজ জীবন। আজ স্মৃতিচারণ করতে করতে একটা গানের কথা খুব মনে পড়ছে - ‘‘মুছে যাওয়া দিনগুলি আমায় যে পিছু ডাকে”।

এই স্মৃতি ভোলার নয়, কলেজ জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি ও করবো তা চিরকাল মনের মণিকোঠায় জীবন্ত হয়ে থাকবে।

কলেজ জীবনের স্মৃতি

রিমা মণ্ডল

আমার গর্ব ও ভালোবাসার অন্যতম প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল হুগলী জেলার আরামবাগের কালিপুরে অবস্থিত 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়', যা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালের ১লা আগস্ট অর্থাৎ আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরের বছর। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অনার্স ও পাস কোর্স মিলিয়ে মোট (২১+৩) ২৪টি বিভাগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগ আপাতত স্বতন্ত্র হলেও এগুলির মধ্যে বিরাজ করছে এক মৌলিক ঐক্য। প্রসঙ্গত বলি, ২০১৬ সালে সানতালি বিভাগে অনার্স নিয়ে ভর্তি হই এবং ২০১৯ সালে স্নাতক (সাম্মানিক) ডিগ্রি লাভ করি।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে অনেক স্মৃতি হাতছানি দিয়ে যেনো আজও ডাক দেয়। কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে পিছনে ফেরার উপায় আর থাকে না। কিন্তু মন মাঝে মাঝেই চলে যায় সেই অতীতে। আজও মনে পড়ে কলেজ জীবনের ফেলে আসা সেই দিনগুলোর কথা।

প্রথম যখন বাবার কাছে জানতে পারি 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'-এ ভর্তি হওয়ার কথা, তখন বাবার ওপর আমার অনেক অভিমান জমা হয়েছিল। সেদিন একটাই কথা বারবার মনের মধ্যে নাড়া দিচ্ছিল যে, এই সদ্য H. S. পাশ করা ১৭+ বয়সের মেয়েকে একজন বাবা বাড়ি থেকে ১৫০ কিমি দূরের একটি কলেজে ভর্তি করতে পারে? এইসব নানা কথা ভেবে অনেক বেশি ভেঙে পড়েছিলাম। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই কলেজ আমাকে এত আপন করে নেবে সেটা আমার কল্পনারও অতীত ছিল।

প্রথম কলেজে এসে কলেজের মনোরম পরিবেশ আমার মন কেড়ে নেয়। বিশেষ করে কলেজের গেটে ঢুকে একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে যে ফুলের বাগান তাতে ফুটে থাকত নানা রকম রং-বেরং-এর সুগন্ধি ফুল। ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে ভিতরে এগিয়ে গেলে আবার নজর কাড়ে দুটি উদ্যান - যার একটিতে আছে আমাদের মহান দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি। তার পাশেই ছিল আমাদের শ্রেণীকক্ষ, যেখানে পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের কলেজ জীবনের তিনটি বছর অতিবাহিত করেছি। শুধুমাত্র তাই না, পড়াশোনার পাশাপাশি কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত, যেগুলির মধ্যে ছিল - শিক্ষক দিবস, বসন্ত উৎসব, শারদোৎসব, সরস্বতী পুজো, বাৎসরিক সোস্যাল। আমার আজও মনে পড়ে শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে গিয়ে সানতালিতে লেখা আমন্ত্রণ পত্র দিয়ে আসা। অলচিকি হরফে লেখা আমন্ত্রণ পত্র দেখে অন্যান্য স্যার ও ম্যাডামদের মনে নানা রকমের কৌতূহলী প্রশ্ন জেগে উঠত এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশ

* প্রাক্তন ছাত্রী, সানতালি বিভাগ

ভালো লাগত। শিক্ষক দিবসের দিন সমস্ত বিভাগ থেকে আগত সকল স্যার ও ম্যাম আমাদের প্রচেষ্টায় আয়োজিত অনুষ্ঠান অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপভোগ করতেন। এইসব কাটানো মুহূর্তগুলো যেন প্রতিটি মুহূর্তে আজও মনে পড়ে।

সরস্বতী পুজোর দিন সকাল সকাল স্নান সেরে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দিনটা শুরু করতাম। পুষ্পাঞ্জলি শেষে কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খিচুড়ি খাওয়া, তারপর জোট বেঁধে ঘোরাঘুরি এবং সেই সাথে প্রধান প্রধান মুহূর্তগুলো ক্যামেরা বন্দী করা। এই ভাবেই কেটেছে আমাদের কলেজ জীবনের সুন্দর দিনগুলি।

পড়াশোনার পাশাপাশি কলেজ থেকে আয়োজিত হত বিভিন্ন ধরণের সেমিনার। যার মাধ্যমে আমরা অনেক অজানা কিছু জানতে পেরেছি এবং সাথে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি, যা আমাদের পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে লেগেছে ও লাগবে।

স্যারদের বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে পাঠদান যা আমাদের মন ছুঁয়ে যেত। পড়াশোনার পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন রকমের মূল্যবান উপদেশ দিতেন। যেমন - সামাজিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভৃতি। জাহাঙ্গীর স্যার, কুঞ্জ স্যার, বিরেন স্যার, স্বরূপ স্যার ও সাহেব স্যার - এনাদের ছত্রছায়ায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। এনাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসায় আমরা জীবনে এগিয়ে যেতে পেরেছি। স্যারেদের দেওয়া উপদেশ আমাদের জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আমাদের এই কলেজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে পাঠরত অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন নামিদামী পেশার সাথে যুক্ত। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী নিজেদের জীবনে সফলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আগামীদিনে আমারও বিশ্বাস যে, আমিও একদিন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবো এবং এই মহাবিদ্যালয়ের গৌরব ধরে রাখতে কিছুটা অবদান রাখতে পারবো।

নেতাজী মহাবিদ্যালয় শুধুমাত্র একটা কলেজ নয়। এটি ছিল আমাদের কাছে আবেগ ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল, যেখানে কাটিয়েছি জীবনের তিনটি বছর। স্যার-ম্যামদের শাসন ও ভালোবাসায় কখন যে তিনটে বছর কেটে গেল তা বুঝতেই পারিনি। এখানে পেয়েছি অনেক বন্ধু-বান্ধবী - যাদের জন্য সময়গুলো এত মধুর হয়ে উঠেছিল। ফেলে আসা কলেজের দিনগুলো হাতছানি দিয়ে আজও যেন ডাক দেয়, কিন্তু পিছনে ফেরার উপায় তো আর নেই। মুহূর্তগুলো মনে পড়লে আজও মনের মধ্যে মেঘ জমে।

কলেজ জীবনে কাটানো এই অনুভূতিগুলো শুধু আমার একার নয়, যে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এই কলেজে পড়াশোনা করেছে তাদের সকলের এই অনুভূতি রয়েছে। আমার যে সকল ভাই-বোনেরা বর্তমানে পাঠরত বা ভবিষ্যতে আসবে তারাও এই অনুভূতির স্বাদ পাবে। আবার নতুন কিছুও পাবে যা হয়তো পরবর্তীকালে তাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো।

Ex-teachers of the Department of Bengali

1. Sri Nandalal Pramanik
2. Sri Ambuj Basu
3. Sri Rabin Adak
4. .Sri Murari Mohan Manna
5. Sri. Ramaprasad Ghosh
6. Sri Shyamsundar Bit
7. Sri Ajit Kumar Bera
8. Sri Subrata Chattopadhyay
9. Smt. Arunima Dutta Chattopadhyay
10. Smt.Tunu Rani Bera
11. Sri Sudipta Nayek
12. Sri Biswajit Biswas
13. Dr. Nisith Mukherjee
14. Sri Saktiman Sinha Roy
15. Sri Soumyabrata Bandopadhyay
16. Smt. Tanima Dutta
17. Sri Dipankar Mondal
18. Smt. Anindita Dasgupta
19. Sri Satyajit Mehta
20. Smt. Tuhina Mondal
21. Smt. Anindita Datta

Ex-teachers of the Department of Botani

1. Dr. Kamal Krishna Sarkar
2. Dr. Tarun Basu
3. Sri Amalendu Samui
4. Dr. Santi Mohan Mandal
5. Smt. Subhra Banerjee
6. Dr. Soumi Banerjee
7. Dr. Pradyut Biswas
8. Dr. Tamal Mandal
9. Sri Durgapada Mandal
10. Sri Rabindra Nath Bhattacharya
11. Dr. Swapan Roy
12. Sri Prabir Kumar Nayek
13. Sri Asish Khan
14. Sri Joydip Mukherjee
15. Smt. Pameli Mukherjee
16. Smt. Madhabi Das
17. Smt. Ranu Mukherjee
18. Sri Krishnendu Samui
19. Sri Utpal Dan
20. Sri Tanmay Chowdhury
21. Sri Nirmalya Jash
22. Dr. Pritha Bhattacharya Sasmal
23. Sri Sourav Dey
24. Sri Kartick Chandra
25. Dr. Animesh Maji

Ex-teachers of the Department of Business Administration

1. Sri Soumya Banerjee
2. Sri Krishnendu Sen
3. Dr. Nilanjan Roy
4. Dr. Mahasweta Roy
5. Dr. Debayan Banerjee

Ex-teachers of the Department of Chemistry

1. Sri. Kalipada Dutta
2. Sri Madan Mondal
3. Sri Nisith Bhakat Chaudhuri
4. Sri Nikhil Chandra Roy
5. Sri Amarendra Nath Roy
6. Dr. Purnananda Chakraborty
7. Smt. Jashodhara Dan
8. Dr. Sunil Kumar Satapathi
9. Dr. Abhijit Roy
10. Dr. Bimal Dirghangi
11. Sri Chinmay Roy
12. Sri Sadananda Bikash Ghosh
13. Sri Partha De
14. Sri Raj Kumar De
15. Sri Raj Kumar Dutta
16. Sri Manoranjan Dash
17. Smt. Chandana Sasmal
18. Smt. Tulika Mondal
19. Sri Subhra Sankha Das
20. Smt. Mukti De
21. Smt. Papiya Sanki
22. Smt. Soma Sarkar

Ex-teachers of the Department of Commerce

1. Sri Aditya Ranjan Chatterjee
2. Sri Bhabani Prasad Chattaraj
3. Sri Sasadhar Koley
4. Dr. Deboprasad Samanta
5. Sri Moni Mohan Nandi
6. Dr. Samir Sinha
7. Sri Ajoy Sarkar
8. Dr. Koushik Chakraborty
9. Dr. Baneswar Kapasi
10. Dr. Swapan Kumar Laha

Ex-teachers of the Department of Computer Sciene

1. Sri Sushanta Mallick
2. Najia Parvin
3. Sri Anirban Gayen

Ex-teachers of the Department of Economics

1. Sri Dipak Banerjee
2. Sri Lakshmi Narayan Ghosh
3. Sri Golam Mayeenuddin Midhya
4. Dr. Tarak Nath Roy
5. Sri Naba Kumar Ghosh
6. Sri Sukumar Banerjee

Ex-teachers of the Department of Education

1. Sri Kajal Kumar Bag
2. Sri Akhil Bandhu Ghosh
3. Sri Buddhadeb Shit

Ex-teachers of the Department of English

1. Sri. Sudhir Kr. Das Pal
2. Dr.Satyabrata Bhattacharya
3. Sri Rabindranath Ghosh
4. Sri Ananta Sarkar
5. Sri Rajib Chakraborty
6. Sri Falguni Ghosh
7. Sri Mukti Prakash Roy
8. Sri Jayanta Ghosh
9. Sri Debiprasad De
10. Sri Debasish Ghosh
11. Sri Sudip Dutta
12. Smt. Chhanda Nandy
13. Smt. Debashree Paul
14. Sri Gourab Chatterjee
15. Sri Rajarshi Kundu
16. Sri Dibyendu Reja
17. Smt. Bratati Barik
18. Sri Soumitra Chatterjee
19. Sri Satadal Chakraborty
20. Sri Sumanta Bhattacharya
21. Smt. Purba Hati
22. Smt. Jayita Nag
23. Smt. Chaitali Giri

Ex-teachers of the Department of Environmental Science

1. Sri Bhaskar Mondal
2. Sri Shibam Mitra
3. Dr. Moumita Sinha

Ex-teachers of the Department of Electronics

1. Sri Manas Pal

Ex-teachers of the Department of Geography

1. Dr. Paramartha Ghosh
2. Smt. Surodhani Ghosh
3. Sri Somnath Sarkar
4. Sri Narayan Jana
5. Sri Sankar Hazra
6. Sri Gouri Sankar Pal

7. Dr. Kuntal Chattaraj
8. Sri Sukamal Guchhayet
9. Sri Soumen Rakshit
10. Smt. Basanti Mondal
11. Smt. Papia Ghosh
12. Smt. Soumita Mondal
13. Smt. Suparna Chowdhury
14. Smt. Kakali Dey
15. Sri Kalyan Mondal
16. Sri Chitra Manna
17. Smt. Samapti Karak
18. Smt. Aradhana Dey
19. Sri Santu Sarkar
20. Sri Bapi Kaibarta
21. Sri Subhamoy Ghosh
22. Sri Saikat Dey
23. Sri Koushik Panja

Ex-teachers of the Department of History

1. Dr. Radha Govinda Kar
2. Sri Brojesh Kumar Das
3. Principal Bijoy Krishna Ghosh
4. Smt. Sima Datta
5. Smt. Nilanjana Basu
6. Sri Goutam Kumar De
7. Sri Sukantamoy Nandi
8. Sri Palash Rom
9. Smt Jayashri Karmakar
10. Smt. Monami Rakshit
11. Smt. Priyanka Meta

Ex-teachers of the Department of Mathematics

1. Sri Pijush Kanti Pal
2. Dr. Rathindra Nath Hazra
3. Dr. Naba Kumar Kundu
4. Sri Tinkari Nayek
5. Dr. Biswajit Pal
6. Dr. Hora Krishna Samanta
7. Dr. Swapan Kumar Ghosh
8. Dr. Ratan Kumar Dutta
9. Sri Naba Kumar Nandi
10. Sri Soumya Subhra Chatterjee
11. Sri Haru Chandra Gour
12. Sri Shyam Chand Mukherjee
13. Smt Annapurna Mal
14. Sri Ayan Pal

Ex-teachers of the Department of Music

1. Smt. Indrani Roy
2. Sri Arnab Chattejee

Ex-teachers of the Department of Philosophy

1. Sri Sitangsu Kumar Dutta
2. Smt. Anindita Chowdhury
3. Dr. Rita Dubey
4. Sri Asim Kumar Pathak
5. Dr. Bimalendu Samanta
6. Dr. Naren Kumar Singh
7. Sri Mansaram Ghosh
8. Sri Sandip Manna
9. Smt. Kakali Bej

Ex-teachers of the Department of Physics

1. Sri Ganesh Chandra Hatui
2. Sri Sristidhar Samanta
3. Sri. Ananda Mohan Mondal
4. Dr. Abani Mohan Rudra
5. Sri Anupam Das

Ex-Demonstrator :

1. Sri Chittaranjan Pan
2. Sri Bhaskar Chandra Nayek

Ex-teachers of the Department of Physical Education

1. Sri Amar Pal
2. Sri Uday Shankar Banerjee
3. Smt. Ruma Goswami
4. Smt. Sayanti Banerjee
5. Sri Gopal Roy
6. Smt. Rita Santra

Ex-Instructors :

1. Sri Dipankar Barui
2. Sri Biswajit Lama

Ex-teachers of the Department of Plant Protection

1. Sri Swapan Roy
2. Dr. Prasenjit Sharma
3. Dr. Asish Pal

Ex-teachers of the Department of Political Science

1. Sri. Dulal Chandra Mal
2. Sri Saktipada Manna
3. Sri Kartick Mondal
4. Dr. Pranab Kumar Dalal
5. Sri Mainak Mondal

Ex-teachers of the Department of Sanskrit

1. Smt Chitralekha Chowdhury
2. Sri Kamal Krishna Bairagi
3. Sri Pranab Kumar Dutta
4. Sri Shaktipada Bhattacharya
5. Sri Nirad Baran Chakraborty
6. Sri Mrityunjoy Acharya
7. Sri Debo Prasad Sinha
8. Smt. Sumita Batabyal
9. Sri Bhaskarananda Kundu
10. Smt. Samapti Roy
11. Smt. Sanchita Samanta
12. Smt. Shampa Roy
13. Sri Santu Banerjee
14. Sri Subrata Khanra

Ex-teachers of the Department of Santali

1. Sri Sidheswar Murmu

Ex-teachers of the Department of Zoology

1. Sri Parimal Kumar Hazra
2. Sri Golok Behari Hazra
3. Dr. Tarun Kumar Ghatak
4. Dr. Manomohan Chakraborty
5. Dr. Swapan Kumar Bhattacharya
6. Dr. Anita Chowdhury (Hazra)
7. Sri Souryadeep Mukherjee
8. Sri Bireswar Bera
9. Dr. Siddhartha Sankar Banerjee
10. Sri Gobinda Chandra Roy
11. Smt. Atreyee Sahana
12. Sri Saptarshi Banerjee

Ex-librarians of Central Library

1. Sri Arun Kumar Gupta
2. Sri Arun Kumar Mukhopadhyay

বর্তমান স্থায়ী শিক্ষাকর্মী

১। শ্রী উদয়চাঁদ কুণ্ডু
২। শ্রী শ্রীকান্ত পাত্র
৩। শ্রীমতী মৌমিতা বৈরাগী
৪। শ্রী অনিন্দ্য দে
৫। শ্রী সহদেব বাগ
৬। শ্রী দেবব্রত ঘোষ
৭। শ্রী পরেশচন্দ্র সাঁতরা
৮। শ্রীমতী নূপুর দাস
৯। শ্রী অভিরাম মাণ্ডি
১০। শ্রী বিবেকানন্দ সরকার
১১। শ্রী শান্তিনাথ মালিক
১২। শ্রী সুশান্ত কুমার কুণ্ডু
১৩। শ্রী শুকদেব মণ্ডল
১৪। শ্রী শঙ্কর ভঞ্জ
১৫। শ্রীমতী চৈতালী মুখার্জী
১৬। শ্রী নিরঞ্জন মালিক
১৭। শ্রী দীপঙ্কর বাড়ুই
১৮। শ্রী পিনাকী সাঁতরা
১৯। শ্রীমতী সন্ধ্যা মাজি (সিংহ)
২০। শ্রীমতী সবিতা মালিক
২১। শ্রীমতী মধুমিতা বাড়ুই
২২। শ্রী সমীরণ মাইতি

বর্তমান অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী

১। শ্রী সুভাষ দাস
২। শ্রী বিশ্বজিৎ লামা
৩। শ্রী প্রসেনজিৎ গাঙ্গুলী
৪। শ্রী সুচিন্ত্য ব্যানার্জী
৫। শ্রী সোম বাহাদুর লামা
৬। শ্রীমতী সান্ত্বনা দাস কচ
৭। সেখ মহঃ রামিজ রাজা
৮। শ্রী আশিষ মালিক
৯। শ্রী রামকমল মিশ্র
১০। শ্রী অশোক সরকার
১১। শ্রী প্রশান্ত সাহা
১২। শ্রী সুনীল সামন্ত
১৩। শ্রী শ্যামলচন্দ্র বাগ
১৪। শ্রীমতী টুসী ক্ষেত্রপাল
১৫। শ্রী শুভদীপ নন্দী
১৬। শ্রী গদাধর সিংহ
১৭। শ্রী জগন্নাথ মুর্মু
১৮। শ্রী মনুরাম মাণ্ডি
১৯। শ্রী মেঘনাথ পাত্র
২০। শ্রী বিশ্বনাথ সাঁতরা
২১। শ্রীমতী মিঠু দে
২২। শ্রীমতী অনু বল্লভ
২৩। শ্রী রাজেশ ডোম
২৪। শ্রীমতী সাকিলা ডোম
২৫। শ্রীমতী রিনা বাগ
২৬। শ্রীমতী বেলা বারুই
২৭। শ্রীমতী মীরা সিং
২৮। শ্রীমতী অলোকা হেমব্রম (হাঁসদা)
২৯। শ্রী কাজল মুর্মু
৩০। শ্রী সালগে হাঁসদা
৩১। শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী

প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী

১। শ্রী অমরনাথ অধিকারী
২। শ্রী অসিত বরণ লায়েক
৩। শ্রী অলোক বেতাল
৪। শ্রী অনিল কুমার কর্মকার
৫। শ্রীমতী আল্পনা রায়
৬। শ্রী উপেন্দ্রনাথ দত্ত
৭। শ্রী কৃষ্ণপদ সরকার
৮। শ্রী কচিরাম মালিক
৯। শ্রী কালীপদ দে
১০। শ্রী গোপালচন্দ্র ব্যানার্জী
১১। শ্রীমতী গায়ত্রী মজুমদার
১২। শ্রী চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
১৩। শ্রী চন্দ্রহাস চক্রবর্তী
১৪। শ্রী জীতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী
১৫। শ্রী দেবব্রত সরকার
১৬। শ্রী দুর্গাকিঙ্কর মুখার্জী
১৭। শ্রী দেবীপ্রসাদ ঘোষ
১৮। শ্রী দিলীপ কচ
১৯। শ্রী দিবাকর বাড়ুই
২০। শ্রী দেহীপদ মণ্ডল
২১। শ্রী দিলীপ কুমার দে
২২। শ্রী নবকুমার গোস্বামী
২৩। নাজির খান
২৪। শ্রী নিমাইচন্দ্র পাল
২৫। শ্রী নারায়ণ জানা
২৬। শ্রী নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল
২৭। শ্রী নীলরতন হাজরা
২৮। শ্রী নন্দদুলাল ব্যানার্জী
২৯। শ্রী নিতাইচন্দ্র গায়েন
৩০। শ্রী পশুপতি বাগ
৩১। শ্রী পরেশচন্দ্র রজক দাস
৩২। শ্রী প্রসাদ রায়
৩৩। শ্রী প্রসেনজিৎ কুমার রায়
৩৪। শ্রী প্রদীপ কুমার ভাণ্ডারী
৩৫। শ্রী পদ্মলোচন সেন
৩৬। শ্রী প্রণব কুমার দাস
৩৭। শ্রী পলাশ ব্যানার্জী
৩৮। শ্রী বিষ্ণুপদ কুণ্ডু
৩৯। শ্রী বিজন কুমার ব্যানার্জী
৪০। শ্রী বিশ্বনাথ পাখিরা
৪১। শ্রী বিমলকৃষ্ণ সেন
৪২। শ্রী বিভূতিভূষণ বাগ
৪৩। শ্রী মহাদেব বাগ
৪৪। শ্রী মদন গোপাল দাস
৪৫। শ্রী মহাদেব পণ্ডিত
৪৬। শ্রী মহাদেব ঘোষ
৪৭। শ্রী রণজিৎ পাল
৪৮। শ্রী রাধাকৃষ্ণ সিংহ
৪৯। শ্রীমতী লক্ষ্মী ভঞ্জ
৫০। শ্রী শ্যামসুন্দর বাড়ুই
৫১। শ্রী শ্যামল নায়েক
৫২। শ্রী শশাঙ্ক শেখর বাড়ুই
৫৩। শ্রী শ্রীকান্ত বিশ্বাস
৫৪। শ্রী শিবশঙ্কর সিংহ
৫৫। শ্রী শিশির কুমার কুণ্ডু
৫৬। শ্রী শৈলেন বাগ
৫৭। শ্রী শঙ্কর মুখার্জী
৫৮। শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ পাল
৫৯। শ্রী সবুজ সরকার
৬০। শ্রী সুব্রত মজুমদার
৬১। শ্রী সোমনাথ ব্যানার্জী
৬২। শ্রী সুনীল কুমার পাল
৬৩। শ্রী সুজিত কুমার দত্ত
৬৪। শ্রী সনাতন দে
৬৫। শ্রী সনাতন তপস্বী
৬৬। শ্রী স্বপন ভট্টাচার্য
৬৭। শ্রী হরিপদ ঘোষ

বিঃ দ্রঃ- সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যদি কোনো প্রাক্তন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুর নাম আমাদের অসাবধানতা বশতঃ উল্লেখ করা না হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। বিষয়টি আমাদের গোচরে আনলে পরবর্তী সংস্করণে বা পুনমুর্দ্রণের সময় তা মুদ্রিত হবে।